প্রথম অধ্যায়

শিশিরকুমার দাশের কবিতা: দর্শনগত প্রজ্ঞার প্রকাশ

১৯৫০ সালে মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে ‘বসুমতী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ‘নৃত্য-পাগল’; শিশিরকুমার দাশের প্রথম মুদ্রিত কবিতা। এরপর ‘পূর্বাশা’, ‘স্পন্দন’, ‘ঊষা’-সহ নানা পত্র-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশ পেতে শুরু করে। কিশোর বয়সের প্রাণ ধর্ম— আবেগের চঞ্চলতা, অনুভূতির অনাহূত প্রয়োগ, তা যথেষ্টভাবেই আভাসিত হতে থাকে এই পর্বের কবিতা-মকশোগুলিতে। ৪ অক্টোবর ১৯৪৯। বছর বারোর এক কিশোর গ্রাম বাংলার শান্ত, স্নিগ্ধ নিবিড়তায় জারিত হয়ে ভরিয়ে তুলছে তাঁর বক্ষলগ্ন কবিতা-খাতা। যার ছত্রে ছত্রে উঁকি দিয়ে যায় বাংলার নিজস্ব রূপ। ছড়িয়ে পড়ে কোমল স্নিগ্ধতার এক আবেশ। সেই খাতারই একটি পাতার খণ্ডাংশ তুলে ধরা হল—

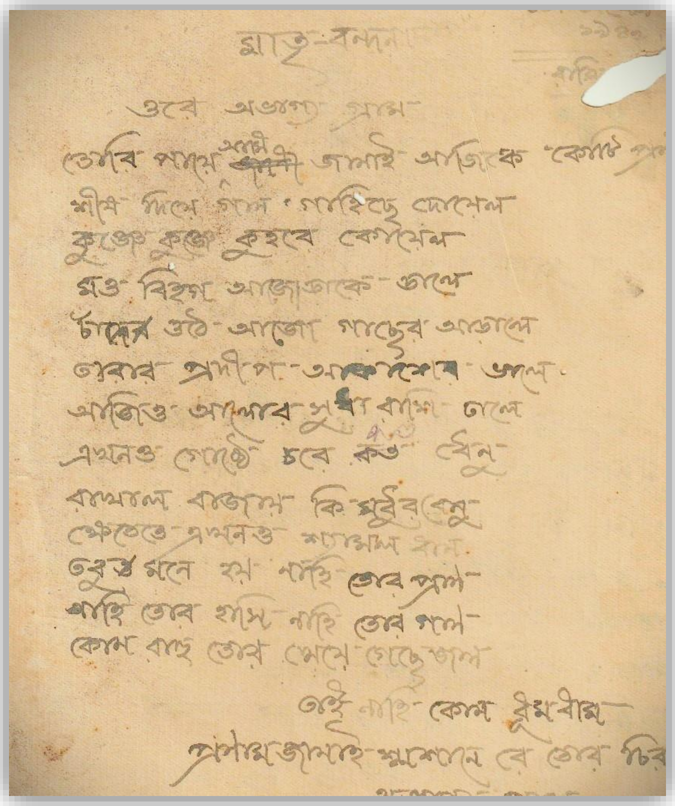
মাতৃ-বন্দনা

ওরে অভাগ্য গ্রাম
তোমারি পায়ে অর্ঘ্য জানাই আজিকে কোটি প্রণাম
শীষ দিয়ে গান গাহিছে দোয়েল
কুঞ্জে কুঞ্জে কুহরে কোয়েল
মত্ত বিহগ আজো ডাকে ডালে
চাঁদের ওঠে আজো গাছের আড়ালে
তারার প্রদীপ আকাশে জ্বলে
আজিও আলোর সুধা রাশি ঢালে
এখনও গোষ্ঠে চরে কত ধেনু
রাখাল বাজায় কি সুরে বেণু
ক্ষেতেতে এখনও শ্যামল ধান
তবুও মনে হয় নাহি তোর প্রাণ
নাহি তোর হাসি নাহি তোর গান
কোন বাধে তোর নেমে গেছে বান
[illegible] নাহি কোন [illegible]
প্রণাম জানাই শ্মশানে যে তোর চির

চিত্র ১: কৈশোর পর্বের কবিতার পাণ্ডুলিপি

‘মাতৃ-বন্দনা’ কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে শিশিরকুমার দাশ ব্যবহার করেন একটি শব্দ— ‘অভাগ্য’। আপাত ‘হতভাগ্য’-এর সঙ্গে পরিচয় আভিধানিক ‘নষ্ট’, ‘নাশপ্রাপ্ত’ বা ‘লুপ্ত’,

'লোপপ্রাপ্ত' অর্থে। বিশেষ ক্ষেত্রে 'অ' শব্দটির ব্যবহার নঞর্থক রূপে। এক্ষেত্রে 'ভাগ্য' শব্দটির পূর্বে যে 'অ'-এর প্রয়োগ ঘটল ('ওরে অভাগ্য গ্রাম') তা অজান্তেই নির্দেশিত করে দিল কিশোর কবির আগামীর পদধ্বনি, নতুনত্বের সম্ভাবনা।

'জীবনস্মৃতি' পড়ে জানি, উপনয়নের পর শান্তিনিকেতনে কিশোর রবীন্দ্রনাথ পাহাড়ের অনুকরণে তৈরি উচ্চ স্তূপ থেকে অপার সৌন্দর্যময় সূর্যোদয় দেখে নতুন জীবন-ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। কিশোর শিশিরকুমারের কাছে এই 'উচ্চ স্তূপ'-টি ছিল চক লালপুর; আর সূর্যোদয়— গ্রামের সৌন্দর্য মাখা সুনিবিড় শান্তি, মেঠো আলপথ। গ্রাম জীবনে স্বল্প বাস-কাল তাঁর হৃদয়ে ভীষণরকম জায়গা করে নিয়েছিল। নাগরিক কোলাহল থেকে নিজেকে বিযুক্ত করার চরম বাসনা প্রতিনিয়ত তাঁকে উদ্দীপ্ত করতে থাকে। অবশেষে একদিন ঘনিয়ে আসে সময়— ফুরিয়ে আসে গ্রামজীবনের সীমিত পরিসর। গভীর মমতায় কবিতা-খাতায় তিনি ফুটিয়ে তুললেন এই গভীর বিষন্নতা, বিরহ। যে গ্রাম ছিল তাঁর নবীন অভিজ্ঞতায় জীবন-সুধা, তার কাছে স্পষ্ট চেয়ে নিলেন 'শক্তি'।

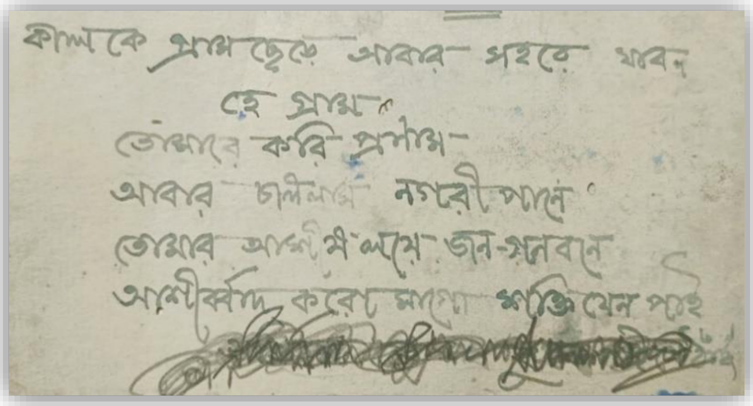

চিত্র ২: কৈশোর পর্বের কবিতার পাণ্ডুলিপি

প্রকোষ্ঠ ভরে বয়ে আনা প্রকৃতির মায়াবী শোভা তিনি এড়াতে পারেননি আশৈশব, আজীবন। তাঁর কবিতার চালচিত্রে ফুটে উঠেছে সেসব। শিশিরকুমার দাশের প্রথম মুদ্রিত কবিতা 'নৃত্য-পাগল' ফিরে পড়লে দেখা যায় সেখানেও রয়েছে প্রকৃতি, প্রকৃতির খেয়ালি রূপ— একটা বিরাট বিস্তৃতি জুড়ে।

এক বিশেষ সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে তাঁর কিশোর পর্বের কবিতাগুলিতে। আর সেই সুর প্রকৃতির অন্তঃস্থল থেকে উঠে আসা। পরিচিত হলেও প্রকাশের গুণে সেই সুর ছড়িয়েছে নতুনত্বের মায়া। তাঁর কবিতার গঠন পর্ব মূলত চল্লিশের দশকের শেষ থেকে পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিক; প্রথম দু-এক বছর। কলেজ জীবন তাঁকে পরিচয় করায় নতুন জীবন-ভাবনায়। মোড় ঘোরে তাঁর কবি চেতনার। ধীরে ধীরে একমুখীন ভাবনার ঘেরাটোপ থেকে

বেরিয়ে এসে ভিড় জমাতে শুরু করে মিথ, প্রতীক, চিত্রকল্প ও ব্যঞ্জনা। প্রাধান্য পায় সংযত ছন্দ ও অলংকারের যথাযথ প্রয়োগ। যৌক্তিক সম্পর্ক তৈরি হতে থাকে উপমান, উপমেয়-র।

১৯৫৬ সালের জুলাই-এ প্রকাশ পায় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'জন্মলগ্ন'। কাব্যগ্রন্থটির ভূমিকায় শিশিরকুমার দাশ যে বক্তব্য তুলে ধরলেন তা থেকেই স্পষ্ট হল তাঁর কবি জীবনের অভিক্ষেপ, অধ্যাবসায় ও দর্শন। তিনি মনে করেছিলেন, তাঁকে সৃষ্টির আনন্দযজ্ঞে সবার নিমন্ত্রণের মধ্যে নিজস্ব একটা স্থান খুঁজে নিতে হবে। খুঁজে নিতে হবে নিজস্ব অস্তিত্ব। আর সেই অনুসন্ধানী অস্তিত্বের খোঁজেই চারপাশে ছড়িয়ে থাকা আনন্দবেদনার পরাগ তিনি অবিরত কুড়িয়ে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। বুকের মধ্যে সাজিয়ে তুলেছেন সেসব, একে একে। নইলে তাঁর অস্তিত্ব হত নিরর্‌থ, গড়ে উঠত না নিজস্ব পরিচিতি। এই জীবনীশক্তিই ছিল তাঁর সমস্ত শিল্প তথা কবিতার মুখ্য আশ্রয়। জীবনের প্রতি মোহ অথচ আশা-ব্যথার দ্বন্দ্বে জুঝতে না চাওয়ার চরম আকুতিই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল সৃষ্টির পথে।

তিনি আশা ব্যক্ত করেছিলেন, তাঁর সৃষ্ট কবিতা যেন পৃথিবীর, মানুষের বা এই দুই ছাড়িয়েও যদি কোনো সত্যের অস্তিত্ব থাকে তবে সেই ত্রয়ী অস্তিত্বে অনুভবের অঙ্গুলিস্পর্শ যে সুর বাজিয়ে তুলবে তা নির্ভর করুক তাঁর নিভৃত তন্ত্রীটির ওপর। তিনি যেমন সুরই বাজান না কেন পাঠক বা শ্রোতা যেন তেমন করেই সেই সুরের আবহটি গ্রহণ করতে সক্ষম হন। তাতেই হবে তরুণ কবির প্রতি, অর্থাৎ তাঁর কবিতার প্রতি সুবিচার। যা তাঁর কণ্ঠলগ্ন নয় তা নিয়ে তিনি বিন্দুমাত্র আপসোস রাখেননি। বরং যেটুকু তাঁর সম্পদ, সামান্য ফুলের মত বা মাঠের গানের মত— সেই সামান্যের মধ্যেই তিনি নিজেকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, মেলে ধরতে চেয়েছেন।

আধুনিক কবিতার বেশকিছু লক্ষণ অনায়াসে গ্রহণ করেও তিনি সবসময় একটা বিচ্ছিন্নতা, বিযুক্তি বজায় রাখার চেষ্টায় মেতে থেকেছেন। এই কাব্য দর্শনের ক্ষেত্রে তিনি মেনে চলেছেন আধুনিকতার নতুন সংজ্ঞা। যেখানে চরম হতাশার ঘেরাটোপের মধ্যে থেকেই ঘোষণা করতে চেয়েছেন বিশ্বাস— জীবনের প্রতি, মানুষের প্রতি। নতুন আঙ্গিকে বাঁচার অনবদ্য প্রয়াসের মধ্যে স্থিত থেকে তিনি কাব্যরচনা করেছেন। সংযতভাবে প্রয়োজনে আশ্রয় নিয়েছেন আঙ্গিকের, কৌশলের। আসলে মধ্যপন্থা নয়, তিনি ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা রেখেছিলেন। আধুনিক হয়েও মানুষ যেমন চিরকালীন তেমনি কাব্যবস্তুও এক চিরকালীন অনুভূতি। যৌবনের প্রথম পর্বেও তিনি শতাব্দীর সঙ্গে শতাব্দীর চারিত্রিক অভিন্নতাকে অস্বীকার করেননি। তাই 'জন্মলগ্ন' কাব্যগ্রন্থে একদিকে যেমন শোনা যায় আশার কথা তেমনি শোনা যায় হতাশার কথাও। আশা-হতাশা দুই বিবাদ-মেরু মিলেই গড়ে তুলেছে এই কাব্যের অন্তর্জগৎ।

তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে, প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের প্রায় তিরিশ বছর পর। যদিও এই দীর্ঘ মৌনতার পর একই বছরে বেরিয়েছিল তাঁর দু-টি

কাব্যগ্রন্থ— ‘অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ’ এবং ‘হয়তো দরোজা আছে অন্যদিকে’। এই দীর্ঘ কালপর্বে কবি জীবনের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে নানা ঘটনার স্রোত। এ সমস্তকিছু পেরিয়ে দীর্ঘ অবসরের পর আচমকা একসময় যৌবনের সেই উদ্দাম, প্রাণচঞ্চল কবি দেখা দিলেন স্বমহিমায়। পাঠককূলকে রীতিমতো চমকে দিয়ে প্রকাশ করলেন ‘অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ’। মুক্তোর মতো স্বচ্ছ স্ব-হস্ত লিপিতে লেখা তিন লাইনের কবিতার সমবায়ে গঠিত এই বই অবলীলায় জায়গা করে নিল বাংলা কবিতার ইতিহাসে।

একশো দুইটি কবিতা বান্ধুলিতে নির্মিত এই বইটিকে একজন প্রাজ্ঞ কবির জীবনবোধের ইমারত রূপে গ্রহণ করাই শ্রেয়। শীর্ণকায় এই কবিতাগুচ্ছের মধ্যে মিশে আছে গভীর ইতিহাস চেতনা, পুরাণবোধ, সমাজভাবনা ইত্যাদি নানা স্তরের রসায়ন। কবি যেন জীবন-সমুদ্রে ডুব সাঁতারে তুলে এনেছেন এক একটি বোধ— সাক্ষী হয়েছেন মানুষের চিরন্তন বদলের। কবিতাগুলির ছন্দের মূল আশ্রয় অক্ষরবৃত্ত। যার তিনটি লাইন এমন শব্দমালায় গাঁথা— অনায়াসেই মনে হয় চতুর্থ লাইনটি অতি প্রত্যাশিত। এই কবিতাগুলির সঙ্গে জাপানি ‘হাইকু’ জাতীয় কবিতার কিছুটা মিল পাওয়া যায়। তবে তা একেবারেই পঙ্‌ক্তিগত। ‘হাইকু’-র আবশ্যিক শর্ত ১৭টি শব্দের সীমাবদ্ধতার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই। ‘অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ’-এর কবিতাগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, গোটা কবিতাটি গড়ে উঠেছে মোট বেয়াল্লিশটি বর্ণের সমাহারে। যার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পঙ্‌ক্তিতে রয়েছে চোদ্দটি করে বর্ণ। অর্থাৎ প্রথম লাইনে ব্যবহিত চোদ্দটি বর্ণ, দ্বিতীয় লাইনে ব্যবহিত চোদ্দটি বর্ণ ও তৃতীয় লাইনে ব্যবহিত চোদ্দটি বর্ণ মিলে গড়ে তুলেছে মোট বেয়াল্লিশ বর্ণের এক-একটি কবিতা।

আঙ্গিকগতভাবে রবীন্দ্রনাথের চার পঙ্‌ক্তির ‘স্ফুলিঙ্গ’-এর কবিতাগুলির সঙ্গে এই কবিতাগুলির সামান্য মিল থাকলেও উভয় কবিতার মধ্যে তুলনা নিতান্তই অমূলক। রবীন্দ্রনাথের ‘স্ফুলিঙ্গ’ পর্যায়ের কবিতার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন নীতি-উপদেশমূলক ভাবনা কাজ করেছিল। কিন্তু শিশিরকুমার দাশের এই কবিতাগুলির মধ্যে অনুভূতির প্রাধান্য অনেক বেশি।

ফরাসি কবি জঁ নিকোলা আর্তুর র‍্যাবোঁ চেয়েছিলেন কবিরা সর্বদা তাঁদের সৃষ্টিতে নতুন ভাব ও আঙ্গিক নিয়ে আসুক। তাঁর কাব্যদর্শনের মূল বক্তব্য ছিল অসীম, অনন্ত ও অচেনা জগতের অনবরত অনুসন্ধান। ‘অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ’ কাব্য পাঠে র‍্যাবোঁর দর্শন অনেকাংশেই সার্থকতা অর্জন করে। এই তিন লাইনের কবিতাগুলির মধ্যে আছে জীবনের অতি সহজ কথা— গভীর বোধের মায়ায় শব্দ জরিয়ে কথা বলার এক দুরন্ত ইচ্ছা। এই সৃষ্টি আসলে সমগ্র বিশ্ব-কবিমনীষার হৃদয় ভাবনা নিঙড়ে ছেনে আনা এক অনবদ্য রেপ্লিকা। তাঁর অন্যান্য সাহিত্য প্রকরণগুলির মতো এখানেও তিনি বজায় রেখেছেন এক পণ্ডিতি রেওয়াজ। তাই কবিতাগুলিতে স্পষ্ট পাঞ্জা ছাপ ফেলেন লরেন্স, লে হাণ্ট, এলিয়েট প্রমুখ। লরেন্সের কবিতায় বিশেষভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায় নারীদেহের প্রতি লোলুপ কামনা ও তীব্র শোষণের চিত্র।

এই কামনা একেবারেই বৈষ্ণব কাব্যের আধ্যাত্মিক কামনা নয় কিংবা ভারতচন্দ্রের কাব্যের নিছক দৈহিক কামনাও নয়। এই কামনা শ্বাপদের, শকুনের। কান্তিক কামনার সীমানা ছাড়িয়ে যার বিস্তার। শিশিরকুমার দাশ এই অ-সুস্থ কামনা বর্ণনায় লেখেন—

(৩৪)

"একটি মুহূর্ত থামে কালের অশ্বেরা
পৃথিবীতে ঘটেছে কি কিছু অলৌকিক?
একটি নারীকে নগ্ন করে শ্বাপদেরা।"[১]

গভীর উপলব্ধি শেষে কবি মনে জমা হয় ঘন বিষাদ। নিজের সমস্ত সৃষ্টি, সমস্ত শিল্পকে মনে হয় অহেতুক। প্রবল হয়ে ওঠে এক বিদ্রোহী সত্তা। এই উপলব্ধির সঙ্গে মিলে যায় নজরুলের কাব্যভাবনা। তিনিও তো সারাটা জীবন ধরে এঁকে গেছেন গভীর বিষাদেরই চিত্র! 'ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ'[২৮]— এই বক্তব্যের মধ্যে যে আর্তি আছে, যে যন্ত্রণার কোলাহল আছে তা নজরুল ফুটিয়ে তুলেছিলেন সরাসরি, কোনোরকম ব্যঞ্জনা বা আড়াল-আবডাল না রেখেই। শিশিরকুমার দাশও নজরুলের নির্ভীক ভঙ্গির আদলেই লিখেছিলেন এসব রক্তলেখা। কটাক্ষ করতে ছাড়েননি নিজের সৃষ্টিকেও।

(৩৭)

"মাঠে মাঠে মৃতশস্য, নদী তীরে শিশু।
কী হবে কবিতা লিখে? তুমি বলেছিলেন।
কবিতা লিখিনা তাই, লিখি আর্তনাদ।"[২]

সাম্প্রদায়িক হানাহানি, রাজনৈতিক রিরংসার প্রতিও তিনি তাঁর সমানাধিকার দৃষ্টির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। আজীবন স্তব করেছেন শিল্পে ও সৃষ্টির। মাথা নত করেননি কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের কাছে। কবীর সুমনের গানের দু-কলির মতো পাকস্থলীতে যাহা জল তাহাই পানির ভাবনায় রেখেছেন অটুট বিশ্বাস। তিনি তাঁর ঈশ্বরের সন্ধান করেছেন প্রকৃটির দারুণ শোভার মধ্যে। যে হৃদয়লগ্ন শোভা তাঁকে বিহ্বল করেছিল কৈশোরে, যৌবনে— মধ্যবয়সে এসেও সেই প্রকৃতির অপার সান্নিধ্যকে তিনি অবহেলা করতে পারেননি। তাই তাঁর কবিতায় মন্দির, মসজিদ, গির্জা সব মিলেমিশে রূপান্তরিত হয়ে গেছে এক মানবিক ইমারতে। তিনি আরাধনা করেছেন ঈশ্বরের সর্বব্যাপী অস্তিত্বের। বাঁটোয়ারা নীতিতে চিরআস্থাশীল শাসকের চোখে চোখ রেখে তাই অনায়াসে তর্জনি উঁচিয়ে সদর্পে তিনি লিখতে পারেন—

(৮৩)

"যখন গোধূলি নামে জামা মস্‌জিদে
মনে হয় ঈশ্বরের আরাধনা করি।
ঈশ্বর কি মসজিদে, গোধূলিতে নয়?"[৩]

দান্তে তাঁর ‘ডিভিন্না কমেদ্দিয়া’ কাব্যে একটি বিশেষ ছন্দরীতির প্রয়োগ ঘটিয়েছিলেন— ইতালিয় ‘টারজারিমা’। ‘অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ’ কাব্যে এই ছন্দোরীতি কিছুটা প্রভাব ফেলেছে। যদিও দান্তের তিন ছত্রের কবিতাগুলিতে যে অন্ত্যমিলের প্রাধান্য ছিল তা এই কাব্যের ক্ষেত্রে শিশিরকুমার দাশ অনুসরণ করেননি। ‘ডিভিন্না কমেদ্দিয়া’-র কবিতাগুলি কাহিনিগতভাবে পরস্পর শৃঙ্খলাবদ্ধ। শিশিরকুমার দাশের এই কাব্যের কবিতাগুলি ভাব ও ভঙ্গি উভয় দিক থেকেই স্বতন্ত্র।

ওই বছরই প্রকাশিত হয় অপর একটি কাব্যগ্রন্থ ‘হয়তো দরোজা আছে অন্যদিকে’। কাব্যগ্রন্থটি ১৯৮৬ সালে প্রকাশিত হলেও কবিতাগুলির মধ্যে সময়কালের তিনটি বিভাজন সুস্পষ্ট। এই কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য কবির নিপুণ সময় সচেতনতা। আধুনিক কবিতার সমস্ত বৈশিষ্ট্য কবিতাগুলিতে লক্ষণীয়। দেখা গেল, কবির সংস্কারে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল তা তিনি অনেকটাই অতিক্রম করে এসেছেন। কবির অন্তরে দেখা দিয়েছে একটা পলায়নি মনোবৃত্তি— জাগতিক কোলাহল থেকে, সমস্তরকম সংযম থেকে। বাস্তবের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন আরও বেশি— এই দীর্ঘ কাল-পর্বেই। উপলব্ধি করেছেন সমাজের প্রকৃত সার। কখনো হয়তো অজান্তেই নিমজ্জিত হয়েছেন পূর্ণ হতাশায়। মুক্তির পথ খুঁজেছেন— বিষাদে, প্রকাশের বৈচিত্র্যে। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাতেই কবি উদ্দেশ্য করছেন একটি মাকড়সাকে—

“নিজের সৃষ্টির মধ্যে নিজে ঢাকা থাকো
স্বচ্ছন্দ নিপুণ কারুকাজ
স্বচ্ছ তবু গোপনীয়, নিরাপদ তবুও বিষাদ
জটিল জালের অন্তরাল
অন্তরাল, তবুও সহজ
নিজের সৃষ্টির মধ্যে নিজে ঢাকা থাকো
অথচ আমার কাছে আত্মঘাতী জাল
সহজের আবরণ সবচেয়ে বড়ো জটিলতা।”[৪]

পুরোনো চেনা কবি নতুন হয়ে দেখা দিলেন এই কবিতার মধ্য দিয়ে। আয়ত্ব করলেন তির্যকভাবে কথা বলার ভঙ্গিমা। আর এখানেই তিনি স্বতন্ত্র হয়ে উঠলেন সমকাল থেকে। এলিয়টের মতে জাগতিক সমস্তকিছুর মধ্যেই রয়েছে কবিতার উপকরণ। শিশিরকুমার দাশ যখন সামান্য একটি মাকড়শাকে তাঁর কাব্যের বিষয় করে তোলেন তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না যে বিষয়হীন বস্তুকেও তিনি এড়িয়ে যেতে চাইছেন না। মাকড়শা এখানে রূপক। কবি তাঁর নিজের সৃষ্টির মধ্যে নিজের ঢাকা থাকার কথাই কি বলতে চাইলেন এখানে! যে জাল (জ্ঞানের

ও প্রজ্ঞার) তিনি রচনা করেছেন সেই জালই কি হয়ে উঠছে তাঁর আত্মঘাতের জন্য দায়ী! জ্ঞানের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেও তিনি ফিরে আসতে পারেননি নিজের দেশে, বাংলায়। প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন বারবার। মিল খুঁজেছেন অভিমন্যুর সঙ্গে— যে অভিমন্যু চক্রবূহ্যে প্রবেশের বদলে কেবল জানত বর্হির্গমনের পথটুকুই। শিশিরকুমার দাশও প্রবাসী হতে পেরেছিলেন— ফিরে আসতে পারেননি কোনোদিন। এই কবিতা আসলে তাঁর ব্যর্থতার কথা বলে। পরিচয় দেয় তাঁর আক্ষেপ অনুভূতির, সেই সঙ্গে সিদ্ধিরও। এই ফিরে আসতে না পারার যন্ত্রণা প্রবলভাবে ভাস্বর হয়ে আছে এই কাব্যেরই 'বিতাড়িত' কবিতায়। উপমা ব্যবহারেও কবি এখানে সৃষ্টি করেছেন অভিনবত্ব। 'ফুলের সুগন্ধ পাই' কবিতায় আছে এই উপমা ব্যবহারের সার্থক প্রয়োগ। যেমন, 'তরঙ্গিত শরীর অপার/ ফুলের সুগন্ধ পাই, ফুল ফোটে শরীরে তোমার।'[৫]

এই পর্বের কিছু কবিতায় দেখা যায় এলিয়টের সুস্পষ্ট প্রভাব। জীবনানন্দের কাব্য ভাষাও অনায়াসে (অনুকরণ করেননি) পাথেয় হয় তাঁর। আসলে সময়ের অস্থিরতা, জীবনের অস্থিরতা, অসহিষ্ণুতা তাঁকে করে তুলেছিল বিষণ্ণ, একাকীত্ববোধে কণ্টকিত। এই একাকীত্ববোধ আসলে কবির সংবেদন চিত্তের দোসর খুঁজে না পাওয়ার একাকীত্ব। শুধুমাত্র সামাজিক প্রাত্যহিকতা ও সাংসারিক চাহিদা পূরণেই তিনি জীবনের সার্থকতা খোঁজেননি। সার্থকতা খুঁজেছেন জার্মান নাট্যকার ব্রেশটের মতো এক গভীর জীবনোপলব্ধিতে। সময়ের নানা অভিঘাত তাঁর ব্যক্তিগত জীবনকে করে তুলেছিল বিস্বাদময়। যা প্রভাব ফেলেছে তাঁর সূক্ষ্ম অনুভূতিতেও।

তাঁর কবিতায় দেখা যায় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর আনুগত্য। এই ইতিহাস চেতনাই তাঁকে প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র নির্মাণে প্রয়াসী করে তোলে। আসলে স্ব-কালের ক্ষয়কে চিহ্নিত করতে গিয়ে, আরও ভাস্বর করতে গিয়ে ইতিহাসের যাবতীয় বিবর্ণতার প্রতি তিনি দৃষ্টি ফেলেছেন।

যেহেতু কবি মাত্রই সংবেদনশীল, তাই সমাজের যাবতীয় ভাঙনের দিনেও তিনি ভুলে যেতে পারেন না মূল্যবোধের যাবতীয় হিসেব। মন ও মেজাজকে করে তুললে পারেন না জ্যামিতিক-জটিল। জটিলতা কবির ধাতে নেই, নেই অন্তত শিশিরকুমার দাশের ব্যক্তিগত ভাবনায়। তাই তিনি সন্ধান করে বেড়ান নতুন দিন। ব্যর্থ হন। তবু স্বপ্নের কাছাকাছি পেতে ভালোবাসেন একটা সুস্থ আলো, মানুষ। যে আলো-মানুষের সমন্বয় তাঁর বেঁচে থাকার বৃত্তে আনায়াসে ছড়িয়ে দেবে পেঁজা তুলোর দিন। দিন না হোক অন্তত একটা কোমল সকাল! হায়নাদের ভিড়ে হারিয়ে যাবার ভয় শিশিরকুমার দাশ পাননি কোনোদিন। ভয় পেয়েছেন হায়নাদের চরম বিষাক্ত নিশ্বাসকে। 'আরণ্যক' কবিতাটি তাই তাঁর সমকালের দ্যোতক হয়ে স্থান করে নেয় এই কাব্যগ্রন্থে। প্রতিনিধি হয়ে ওঠে গোটা সমাজের, মানুষের। সেই সঙ্গে কবির যাবতীয় আত্মপোলব্ধির। প্রসঙ্গত, গুজরাট দাঙ্গার প্রেক্ষাপটে রচিত 'বাঘ' নাটকটির মূল দর্শন নিহিত রয়েছে এই কবিতায়।

"মোটরের জানালায় ইদানীং প্রায় দেখি বাঘ
সেই হিংস্র হাসি, সেই ডোরা কাটা দাগ...
অতর্কিত চেয়ে দেখি শীতের সন্ধ্যায়
কয়েকটি হায়নাকে নিয়ে প্লেন উড়ে যায়
আমার শহর থেকে তোমার শহরে
কিংবা অরণ্য থেকে অরণ্যান্তরে।"[৬]

১৯৯২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর শেষ এবং চতুর্থতম কাব্যগ্রন্থ 'বাজপাখির সঙ্গে কিছুক্ষণ'। মোট চব্বিশ পৃষ্ঠার ক্ষীণ পরিসরের এই কবিতাগুলি শুধুমাত্র কবির অনুভূতির সাক্ষ্য হয়েই থেকে যায় না। সংখ্যা চিহ্নিত কবিতাগুলির মধ্যে অনায়াসে এসে মেশে কবির যাবতীয় অর্জিত প্রজ্ঞা। পরিচায়ক হয়ে ওঠে কবির বৈশ্বিক জ্ঞানের। দেশ ও বিদেশের নানান অনুষঙ্গ, ইতিহাস, মহাকাব্য বিষয় হিসেবে মেশে এই ক্ষীণকায় বইটিতে। সচেতন ছন্দ ও কুশলী গদ্যের ব্যবহারে, অনুভূতির নানা রকমফেরে, ভাব, ভাষা ও ভঙ্গির চাতুর্যে কাব্যগ্রন্থটিতে কবি সৃষ্টি করেন এক পরাবাস্তব জগৎ। কবিতাগুলির মধ্যে একাধিক ছন্দের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। কিছু কবিতায় আছে নাটকীয় ভাব ও ভঙ্গি। কবির আজীবন লালিত যাবতীয় কবিতা বিষয়ক খুঁটিনাটি ভাবনা হুরমুরিয়ে জায়গা করে নেয় এই কাব্যে। আদ্যপান্ত পাঠে মনে হয় কবি যেন একটা বিশেষ ঘোরের মধ্যে সমগ্র গ্রন্থটির অবয়ব নির্মাণ করেছেন। কিছু কবিতার বর্ণনায় পাওয়া যায় বাস্তব ও কল্পনার অনবদ্য যুগলবন্দী। বেশ মজার ছলে গাথা হয় কিছু সংলাপ। 'মুখোসপরা লোকজন' কবিতাটি কবি মনের সেই রসবোধের পরিচয় দেয়।

সংলাপধর্মী কবিতার বুননেও পাওয়া যায় অনন্যতার ছাপ। কিছু কবিতায় যে ভঙ্গিতে কবি সংলাপগুলির প্রয়োগ ঘটান তাতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নাটকীয়তা। 'ট্যাকসি, জাহাজ' কবিতাটিতে পাওয়া যায় গল্পবলার এক অনবদ্য কৌশল—

"ছোকরা সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল ফিল্মি নায়কের ভঙ্গিতে
গাড়ির ভেতরে ফুঁকি না স্যার, ফরেনাররা আপত্তি করে
তারপরই গাড়িটা একটা ইউ-টার্ন নিলে"[৭]

বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আজও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে তাঁর বহু কবিতা। সেই কবিতাগুলি একদিকে যেমন ঐতিহাসিক মূল্যে সমৃদ্ধ তেমনি কবিতাগুলির সঙ্গে যোগ রয়েছে কবির ধ্রুপদি চিন্তার। ১৯৮৪ সালে শিশিরকুমার দাশ ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সমাজবিজ্ঞানের গবেষণা পরিষদ-এর অন্যতম সদস্য হিসেবে সাহিত্য বিষয়ক এক আলোচনাসভায় রাশিয়ার লেলিনগ্রাদে যান। তাঁর ডায়েরি থেকে জানা যায়, ৭ অক্টোবর, রবিবার ভারতীয় প্রতিনিধিদের

নিয়ে যাওয়া হয় সেখানকার পুশকিন নামক এক গ্রামে। সেখান থেকে ফেররা পথে নামা হয় লেলিনগ্রাদ যুদ্ধের সমাধিক্ষেত্রে। এই সমাধিক্ষেত্রের বিস্তর নীরবতা কবি হৃদয়কে বিষণ্ণ করে তোলে। সেদিনই হোটেলে ফিরে এই অভিজ্ঞতাকে নির্ভর করে তিনি একটি কবিতা লিখেন। এবং পরের দিন আলোচনা সভায় বক্তব্যের শেষে সেই কবিতাটি ইংরেজি অনুবাদে পাঠ করেন। তিনি লিখেছিলেন,

"তোমার সব বীরত্বের স্মৃতিতে
লেলিনগ্রাদ
মাথা নিচু করে হাঁটি
তোমার
ক্ষুধাজয়ী, নিদ্রাজয়ী, মৃত্যুজয়ী
আকাশের সামনে
প্রণত হবার কোনো অধিকার কি
আমার আছে
আমার লেলিনগ্রাদ?"[৮]

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন বয়সী রুশ নারী-পুরুষ। কবিতাটি পাঠের পর সভায় উপস্থিত সকলের চোখ চিকচকে হয়ে ওঠে। এমনকি কেউ কেউ চোখে রুমালও নাকি চেপে ধরেছিলেন! কবিতার মধ্য দিয়ে দেশ ও ভাষার সীমা অতিক্রম করে মানুষের হৃদয়কে নাড়িতে দিতে পারার এই ঘটনাই প্রমাণ করে তাঁর কবি শক্তির মাহাত্ম্য।

কৈশোরের প্রথম পর্বে কবিতা লেখার প্রয়াস থেকে শুরু করে জীবন সায়াহ্নে এসে পরিণত কাব্যজগতে শিশিরকুমার দাশের সাবলীল পদচারণার আভাসকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা করা হল এই সামান্য পরিসরে। দ্বিধাহীনভাবেই স্বীকার্য যে, এই সংক্ষিপ্ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে শিশিরকুমার দাশের মতো একজন বড়ো মাপের কবির কবিতার যাবতীয় ভাবনা, খুঁটিনাটিকে ধরা রীতিমতো দুঃসাধ্য। তাঁর সমস্ত মৌলিক কাব্যগ্রন্থ, বেশকিছু অপ্রকাশিত, অগ্রন্থিত কবিতাকে আশ্রয় করে এগিয়েছে এই আলোচনা। জীবন ও সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কবি শিশিরকুমার দাশের ভাবনায়, অভিজ্ঞতায় ঘটেছে পরিবর্তন। সেসবের ছায়া পড়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতার এই বাঁক-বদলের দিকটি এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১. শিশিরকুমার দাশ, “৩৪ সংখ্যক কবিতা”, ‘অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ’, ১ম প্রকাশ, নিউ দিল্লি, আই এম এইচ, এপ্রিল ১৯৮৬, পৃ উল্লেখ নেই

২. তদেব, “৩৭ সংখ্যক কবিতা”

৩. তদেব, “৮৩ সংখ্যক কবিতা”

৪. তদেব, “৮১ সংখ্যক কবিতা”

৫. শিশিরকুমার দাশ, “মাকড়শা”, ‘হয়তো দরোজা আছে অন্যদিকে’, ১ম প্রকাশ, নিউ দিল্লি, মন্দাক্রান্তা, ১৯৮৬, পৃ ০৯

৬. তদেব, “আরণ্যক”, পৃ ১৫

৭. শিশিরকুমার দাশ, “১৪. ট্যাকসি, জাহাজ”, ‘বাজপাখির সঙ্গে কিছুক্ষণ’, ১ম প্রকাশ, কলকাতা, সীমন্তিনী, দেবীপক্ষ ১৩৯৯, পৃ ১৮-১৯

৮. শিশিরকুমার দাশ, “তোমার বীরত্বের স্মৃতিতে লেলিন গ্রাদ”, প্রতিক্ষণ, ১৭ নভেম্বর ১৯৮৪, পৃ ২২

চিত্রসূত্র

১. শিশিরকুমার দাশের কৈশোর পর্বের কবিতার পাণ্ডুলিপি

২. ওই

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিশিরকুমার দাশের নাটক: চেতনা ও প্রজ্ঞার দার্শনিক উদ্ভাষণ

সৃজনশীল সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় শিশিরকুমার দাশের সর্বাধিক স্বীকৃতি নাট্যকার হিসেবেই। ‘চশমা’ তাঁর প্রথম রচিত নাটক। এই প্রহসনে রয়েছে তিনটি দৃশ্য। এর কাহিনিটি আবর্তিত হয়েছে বুদ্ধ, গদা, কচি, রামু— এই চার কিশোরের খেয়ালি কিছু ভাবনাকে কেন্দ্র করে। আর তাদের সমস্ত ভাবনার মূলে আছে একটি চশমা। অতয়েব প্রহসনের নামকরণটি সমগ্র কাহিনির ইঙ্গিতবাহী। এই চার কিশোর নতুন কিছু করার চেষ্টায় মত্ত। মহৎ তাদের প্রয়াস। আপাতভাবে তাদের এই ভাবনাকে কুর্নিশ জানাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ঘটনার চলমানতায় অতি সহজেই ধরা পড়ে তাদের প্রকৃত মুখ ও মুখোশ। শেষ দৃশ্যে রতন ও বুদ্ধর বোন কৃষ্ণার সংলাপের মধ্য দিয়ে দর্শকের চোখে তাদের সমস্ত ভণ্ডামিগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

তাঁর দ্বিতীয় নাটক ‘দুঃখ-দয়া-সান্ত্বনা’। এই নাটকের মধ্য দিয়ে নাট্যকার ঊনবিংশ শতাব্দীর নর-নারীর প্রেমের একটি অতি স্বাভাবিক চিত্র তুলে ধরেছেন। শিশিরকুমার দাশের সৃজনে এই নাটকের সবচেয়ে ব্যক্তিত্বময় চরিত্র হয়ে উঠেছে নন্দিতা। নারীর চির পরিচিত মানিয়ে নেওয়ার তকমা গায়ে লেপে সে স্বামীর চারিত্রিক স্খলনে নীরব থাকতে পারেনি। প্রতিবাদ করেছে, বিনয় বজায় রেখেই অনুসন্ধান করেছে সমস্ত কার্যকারণ। তার এই প্রতিবাদ শুধুমাত্র তার নিজস্ব বৃত্তেই আবদ্ধ থাকেনি। পুরুষ শাসিত সামাজের বিরুদ্ধে নন্দিতা হয়ে উঠেছে এক প্রতিবাদী মুখ— নারীর মুখ বুজে সমস্তকিছু সহ্য না করার শুরুয়াৎ।

‘আদিম অন্ধকার’ নাটকটির মূলে রয়েছে ‘দুঃখ-দয়া-সান্ত্বনা’ নাটকটির প্রভাব। পূর্বের নাটকটি কিছুটা অদল-বদল করে ‘আদিম অন্ধকার’ নাটকটি লেখা হলেও দু-টি নাটকের মধ্যে কাহিনিগতভাবে বিস্তর ফারাক রয়েছে।

শিশিরকুমার দাশ রচিত তৃতীয় নাটক ‘ঝড়’। ষাটের দশকের শেষ, সত্তর দশকের শুরু। সমগ্র বাংলা তখন নতুন দিনের স্বপ্নে উত্তাল। ঝড় উঠেছে বাংলার আকাশে। যে ঝড়ের নাম ‘নকশাল’ আন্দোলন। সাহিত্যে এই আন্দোলনের প্রসঙ্গ নানাভাবে জায়গা করে নিয়েছে। সেই তালিকায় এই ‘ঝড়’ নাটকটিও একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

‘সূর্যাস্তের পরে’ নাটকটিতে গ্রিক ট্র্যাজেডির প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নাটকটির সঙ্গে সফোক্লেসের ‘রাজা ওইদিপৌস’-এর সরাসরি যোগ রয়েছে। যোগ রয়েছে নকশাল আন্দোলনেরও। সত্তরের দশকে একদিকে আদর্শবাদী কিছু যুবকেরা যেমন ‘বন্ধুকের নল’-এ ভর করে দিন বদলের নেশায় মেতে ওঠে তেমনি তাদের পাশাপাশি কিছু মানুষ অবলম্বন করে সুবিধাবাদের হীন পন্থা। এমন জটিল সামাজিক পরিস্থিতিকে কাহিনির প্লট হিসেবে রেখে

শিশিরকুমার দাশ ব্যঞ্জনার মাধ্যমে নিয়ে এসেছেন বিপ্লবের প্রসঙ্গ। কোনোরকম রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে নয়, মানুষের সংগ্রামের প্রতীক রূপে বিপ্লবকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। মানুষের স্বতঃস্ফুর্ত দাবিতে এই নাটকে জন্ম হয়েছে এক দেব শিশুর। শিশুটি আসলে বিপ্লবের রূপক। নাটকের সকল জনতা (রূপকার্থে সমাজের) সমগ্র কাহিনি জুড়ে শেষ পর্যন্ত যার প্রতীক্ষায় থেকেছে।

'জীমূতবাহনের গারো যাত্রা' কৌতুক-নাটিকার মুখ্য চরিত্র জীমূতবাহন মুখোপাধ্যায়। পেশায় তিনি একজন লোকশ্রুতিবিদ্। তিনি এবং তাঁর কয়েকজন ছাত্র মিলে 'ফোকলরিস্ট অ্যাসোসিয়েশন' নামে একটি সংস্থা পরিচালনা করে। সমাপ্তি অংশে দেখা যায় জীমূতবাহন গারো পাহাড়ের এক অষ্টাদশী মেয়ে বিয়ে করার ঘটনাটি উল্লেখের মধ্য দিয়ে নাট্যকার পৌঢ় জীমূতবাহনের বিকৃত যৌন লালসার প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন।

'নতুন দেবতা' কাহিনি বর্ণনায় কিছু ক্ষেত্রে রবীন্দ্র নাট্যরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। দৃশ্য ভাগহীন এই নাটকটির মধ্যে কিছুটা 'মুক্তধারা' ও কিছুটা 'রক্তকরবী'-র প্রভাব রয়েছে। গ্রিক রীতি অনুসারে আছে কোরাসের ব্যবহার।

'চন্দ্রহাস' নাটকের কাহিনির বুননে, দার্শনিক ভাবনায়, মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনে এই নাটকের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্র নাটকের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের সুমতি-কুমতি দ্বন্দ্বের বিষয়টি প্রথম কণ্ঠস্বর ও দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর হিসেবে তিনি তুলে এনেছেন। যেখানে প্রথম কণ্ঠস্বর উদারতা, বিবেক, মানবিকতা ও মনুষ্যত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। আর দ্বিতীয় কণ্ঠস্বর লোভ, ক্ষমতা, অহংকার ও ঈশ্বর্যের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

রূপক সাংকেতিক নাটক 'একটি মৃতদেহ' একাঙ্কে মাত্র সাতটি চরিত্রের সমন্বয়ে এক গভীর জীবনবোধকে ব্যঞ্জনার সাহায্যে রূপায়িত করা হয়েছে।

'কুমির' নাটকে গ্রিক নাটকের রীতি অনুসারে ভাগ্যের ওপর চূড়ান্ত নির্ভরশীল মানুষের জীবনের চরম ট্র্যাজিক দিকটি এই নাটকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই নাটক গ্রামের একজন সাধারণ মানুষের ভাগ্যের সঙ্গে তার চিরন্তন সংগ্রামের গল্প শোনায়।

'পরশুরাম' নামটির মধ্যেই নিহিত আছে এই নাটিকার যাবতীয় বিষয়বস্তু। পরশুরামও পিতা জমদগ্নির একতরফা আদেশে কোনোরকম যুক্তির তোয়াক্কা না করেই মাতা রেণুকাকে কুঠারের আঘাতে হত্যা করেছিল। নাট্যকার প্রদীপ চরিত্রের মধ্য দিয়ে এই পুরাণ প্রসঙ্গটির নবনির্মাণ ঘটিয়েছেন।

শিশিরকুমার দাশের প্রথম কাব্যনাটক 'ভাঁড়ু দত্ত'। মুকুন্দরাম যাকে একজন শঠ, ধূর্ত, পরধন লোভী ব্যক্তি হিসেবে নির্মাণ করেছিলেন সেই চরিত্রেরই পুনঃনির্মাণ করেছেন শিশিরকুমার দাশ। তার মতো চরিত্র শুধুমাত্র মধ্যযুগেই নয়, যে কোনো যুগের ক্ষেত্রেই

ভীষণভাবে বাস্তব সম্মত। তাই 'ভাঁড়ু দত্ত' চরিত্রটিকে নাটকে তুলে আনার ক্ষেত্রে একটা যুগানুগ তাগিদই অনুভূত হয়েছিল।

'ভোমরা' একাঙ্ক নাটকে পুঁজিবাদের চরম আস্ফালনকে নাট্যকার নাট্যরূপ দিয়েছেন।

মহাভারতের কাহিনি নির্ভর 'উত্তরা' একাঙ্ক নাটকটি উত্তরার মানসিক পরিবর্তনকে তুলে ধরে দ্রৌপদীর সংলাপের মধ্য দিয়ে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্যকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

'বাংলার মুখ' নাটকে নাট্যকার পূর্ব পাকিস্থানের মুক্তিযুদ্ধে নিবেদিত প্রাণ বিপ্লবীদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্থানের সৈন্যদের মধ্যে ঘটে চলা সম্মুখ সমরকে নাট্যরূপ দিয়েছেন।

'হে দুর্ভিক্ষ, হে বন্যা' প্রহসনে দিল্লিবাসী কয়েকজন উচ্চবিত্ত মহিলাদের অলস জীবন যাপনের চিত্র তুলে এনেছেন। নাটককারের সংলাপ নির্মাণের অনন্যতা এই প্রহসনের অপর একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

নাট্যকার হিসেবে শিশিরকুমার দাশের স্বীকৃতির পেছনে সক্রেটিসকেন্দ্রিক দু-টি একাঙ্ক নাটক 'সক্রেটিসের জবানবন্দী' ও 'সক্রেটিসের সন্ধান' অন্যতম। 'সক্রেটিসের জবানবন্দী' সক্রেটিসের বিচারপর্বকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। আর এই বিচারের উদ্দেশ্যে একাদশ চক্রের প্রতিনিধি দল সক্রেটিসকে সমগ্র আথেন্স জুড়ে খুঁজে বেরিয়েছে। এই অনুসন্ধান করার ঘটনাই রয়েছে 'সক্রেটিসের সন্ধান' নাটকটির মূলে।

১৯৮৩ সালে লেখা 'মুচিরাম গুড়' বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক নকশা 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'-এর নাটকীয় সংস্করণ। নাটকটির ক্ষেত্রে শিশিরকুমার দাশ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার অধিকাংশ ঘটনা অনুসরণ করলেও মঞ্চের চাহিদা মেটাতে বহু স্থানে তিনি যথেষ্ট মৌলিকত্বের ছাপ রেখেছেন।

শিল্প-সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য পুরস্কার প্রদানকে কেন্দ্র করে নির্বাচকদের মধ্যে যে সমস্ত উদ্ভট কাণ্ডকারখানা চলে তাকেই হাস্যরসের মাধ্যমে 'পুরস্কার প্রহসনম্' নাটকে পরিবেশন করা হয়েছে।

শিশিরকুমার দাশের সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরার একটি নাটক 'তুলপুলে অন্তর্ধান রহস্য অথবা আরিস্টটলের পুথি'। রীতিতে নাটক হলেও এর মধ্যে রয়েছে থ্রিলারের টানটান উত্তেজনা। নাট্যকার অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে নাটকটির প্লট গড়ে তুলেছেন। তাই সম্পূর্ণ কল্পিত ঘটনা ও চরিত্রের নিরিখে নির্মিত এই নাটকটিকে ইতিহাস সম্মত মনে করলে ভুল হবে। এই নাটকের মধ্যে একটা সিনেম্যাটিক আবহ আছে। কাহিনি বলার ধরণে অনুমেয় হয় শিশিরকুমার দাশ যেন একটি চিত্রনাট্য রচনা করেছেন। নাটকের পরিচিত অঙ্ক ও দৃশ্য ভাগ এতে থাকলেও সেগুলো যেন ভীষণভাবে এপিসোডিক। তাই প্রতিটি দৃশ্যের ক্ষেত্রেই মূল ঘটনার নিরিখে তিনি উপশিরোনামের ব্যবহার করেছেন। ভবিষ্যতে এই নাটক সফলভাবে মঞ্চস্থ হলে তা নাট্যমঞ্চের

ইতিহাসে নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা ঘটাবে। তবে পাঠ্য হিসেবেও এই নাটকের গুরুত্ব নেহাৎ কম নয়।

শিশিরকুমার দাশের ‘শ্যামা’ রবীন্দ্রনাথের ‘শ্যামা’ নৃত্যনাট্যকে অনুসরণ করেই রচিত। বিষয় ও দর্শনগত ভাবাদর্শে দু-টি নাটকের মর্মবস্তু অভিন্ন হলেও শিশিরকুমার দাশ রবীন্দ্রনাট্যভাবনাকে বিন্দুমাত্র অনুকরণ করেননি। বরং তাঁর অসামান্য নির্মাণ কৌশলে শ্যামা চরিত্রটির পুনর্মূল্যায়ন ঘটেছে।

চার দৃশ্যের একটি ছোটো নাটিকা ‘নাটক চুরির নাটক’। এক ব্যক্তির নাটক চুরি করে নাট্যকার হয়ে ওঠার ঘটনাকে এখানে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছে।

‘কালবেলা’ পত্রিকার মার্চ ২০০৩ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় ‘বারবেলা’ নামে একটি মজার একাঙ্ক। কাহিনিগতভাবে এই নাটকের সঙ্গে পূর্বোক্ত নাটকটির যথেষ্ট মিল রয়েছে।

শিশিরকুমার দাশের দু-টি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী নাটক ‘আকবর-বীরবল’ ও ‘বাঘ’। দু-টি নাটকই ৬ ডিসেম্বর ১৯৯১ সালের অযোধ্যা কাণ্ড ও তার পরবর্তী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে রচিত। ‘আকবর-বীরবল’ নাটকে বীরবল চরিত্রটিকে শিশিরকুমার দাশ ভারতের হাজার বছরের ইতিহাসের এক প্রতিনিধি চরিত্র রূপে গড়ে তুলেছেন। সে নিজের বর্তমানের নাম ভুলেছে, ধর্ম ভুলেছে, পরিচয় ভুলেছে। অথচ অনায়াসেই সে মনে করতে পারে তার বহুজন্মের কথা। স্মৃতিতে ধরে রাখে বহু শতাব্দীর ইতিহাস। আসলে প্রকৃত ভারতবর্ষ বেঁচে থাকতে চায় তার ইতিহাসের সমস্ত মুহূর্তগুলোকে এককাট্টা করে। কিন্তু পরস্পর বিরোধী দুই ধর্মীয় শক্তি তার সেই স্বপ্নে কাঁটা হয়ে দাঁড়ায়। নাটকটির সমাপ্তিতে তাই বীরবলকে খুন করা হয়। মৃত দেহ পাওয়া যায় মসজিদ বা মন্দিরের ভগ্ন স্তূপে। এই ঘটনার মধ্যেই সমগ্র নাটকটির মূল বার্তা লুকিয়ে। আপাতভাবে সে খুন হলেও গূঢ়ার্থে খুন হয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, ভারতবর্ষ। যে ইতিহাস, যে ঐতিহ্য বহু শতাব্দী ধরে লালন করে চলছিল দেশ, বীরবলের ছদ্মবেশে।

উক্ত নাটকে শিশিরকুমার দাশের যে ইতিহাস চেতনা আনত প্রত্যয়ে উঠে এসেছে ‘বাঘ’ নাটকটিকে তারই দ্বিতীয় সংস্করণ বলা চলে। সমগ্র নাটকজুড়ে এক গভীর প্রশ্নের সমাধান খুঁজেছেন শিশিরকুমার দাশ। ভূমিকাংশে সেসব প্রশ্নেরই একটা আভাস মেলে। এই গল্পের বাঘ আসলে সংকীর্ণ মানসিকতার প্রতীক। যে বর্বর মানসিকতা হিংস্র বাঘের ছদ্মবেশ ধারন করে ষড়যন্ত্রে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরি করেছে। জাতের নামে বজ্জাতি, জাত জালিয়াত জুয়া খেলায় মত্ত এই বাঘেরাই ঘটিয়েছে নির্বিচার হত্যা, ধর্ষণের মতো পাশবিক ঘটনা। বাবরি মসজিদ ধ্বংস করে সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছে দ্বেষ। শিশিরকুমার দাশ তাই গভীর হতাশায় সমগ্র নাটক জুড়ে এই ‘বাঘ’-এর হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজেছেন।

শিশিরকুমার দাশের নাট্য খ্যাতির নেপথ্যে বিরাট ভূমিকা জুড়ে আছে ‘অলৌকিক সংলাপ’। নাটকের পরিচিত প্রকরণ মাথায় রেখে গ্রন্থটি রচিত হয়নি। প্রথম সংলাপ ‘নাটক বিচার:

কালিদাস ও অ্যারিস্টট্‌ল'-এর মধ্য দিয়ে 'ভারতীয় সাহিত্যে ট্র্যাজেডি'-র অবস্থানটিকে তিনি স্পষ্ট করেছেন। বাকি ন-টির মধ্যে প্রথম সংলাপে তিনি মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন 'তিন অন্ধ'— ধৃতরাষ্ট্র, ওইদিপৌস ও তেইরেসিয়াসকে। দ্বিতীয় ভাগের দ্বিতীয় সংলাপটি মিলিয়েছে মাতৃ হত্যার দায়ে আত্মদগ্ধ পরশুরাম ও ওরেসতেসকে। এই সংলাপে উঠে আসে তাঁদের আত্মসমালোচনা। 'মৃত্যুলোকে সশরীরে' সংলাপে এক সূত্রে গ্রথিত হয়েছে সাবিত্রী, বেহুলা ও এউরুদিকে। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের মধ্যে কিছু মিল খুঁজে পেয়ে পরস্পরের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে জীবনকথা। 'দুই অতিথি' সংলাপে কথা বলেছে প্যারিস ও ইন্দ্র। ভাগ করে নিয়েছে নিজেদের শাসনলঙ্ঘিত প্রণয়বৃত্তান্ত। 'দুই বৃদ্ধ' সংলাপে নিজেদের পুত্র শোক, রাজ্য শোকের কথা ভাগ করে নিয়েছেন প্রায় একই অভিজ্ঞতায় তপ্ত— ট্রয় ও মহাভারত যুদ্ধের দুই প্রবীণ প্রিয়াম ও ধৃতরাষ্ট্র। 'তরুণ তরুণী' সংলাপে শিশিরকুমার দাশ অভিমন্যু ও ইফিগেনেইয়াকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছেন। তাদের এই আলাপচারিতা উভয়কে মিলেছে দিয়েছে একটি বিন্দুতে— তারা উভয়েই যুদ্ধের বলি। 'উর্বশী ও আর্তেমিস' সংলাপে আলাপ চলেছে উর্বশী, আফ্রোদিতে ও আর্তেমিসের মধ্যে। আর্তেমিস ও উর্বশী মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে অভিজ্ঞতায়। আর তাদের সেই অভিজ্ঞতার নেপথ্য নায়ক— অর্জুন ও হিপ্পোলুতুসও মিলে গেছে এক বিন্দুতে। 'তিন বন্দিনী' অংশে পেনেলোপি, হেলেন ও সীতা— এই তিন নারীর ভাগ্যকথা এক বিন্দুতে মিলিয়েছেন শিশিরকুমার দাশ। 'দুই বালক' সংলাপের দু-টি চরিত্র আস্‌তুয়ানাক্স ও অমল। আস্‌তুয়ানাক্স গ্রিক মহাকাব্য থেকে উঠে এসে রবীন্দ্রনাথের 'ডাকঘর' নাটকের অমল চরিত্রটির পাশে বসেছে। দু-জনের দেশ-কাল মৃত্যুর কারণ সবই ভিন্ন। ভিন্ন তাদের পুনর্জন্মের প্রত্যাশার কারণও। তবু তারা বন্ধু পাতিয়েছে একটি মিলের নিরিখে; উভয়েই আরও একটিবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে চায়।

'সত্যমেব জয়তে' প্রহসনে একবিংশ শতাব্দীকে পটভূমি রেখে শিশিরকুমার দাশ যে সমাজে সত্যবাদ নিতান্তই বিরল, যে সমাজে সততা আণুবীক্ষণিক সেই সমাজের সার সত্যকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন।

ভোগবাদ ও লোভ-লালসার পরিণতি মানুষের জীবনে কতটা ভয়ঙ্কর প্রভাব ফেলতে পারে সেই বার্তাই ধরা আছে 'সিন্দুক'-এ। ব্রজসিংহের অন্ধ পিতা ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। এই অন্ধ বৃদ্ধ চরিত্র নির্মাণে ত্রিকালজ্ঞ ওরেসতেসের প্রভাব রয়েছে। গ্রিক পুরাণের এমন স্বাচ্ছন্দ্য প্রয়োগ একমাত্র শিশিরকুমার দাশের পক্ষেই সম্ভব। রূপকথার আবহকে বাস্তবের রূপ দিতে নাট্যকার অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে কাহিনির সূচনায় এক বৃদ্ধাকে সূত্রধার হিসেবে নিয়ে এসেছেন।

এক বয়স্ক দম্পতির শূন্যতাবোধ 'খেলা' নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়।

১৯৯৭ সালে 'প্রমা' পত্রিকার ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার একাঙ্ক নাটক 'পুরুষ পুরুষ কর্ছ কারে'। শারীরিক বৈশিষ্ট্য লিঙ্গ নির্ধারণের একমাত্র মাপকাঠি নয়।

তা নির্ভর করে মানসিকতার ওপর। কিন্তু পুরুষ নির্ধারিত সামাজিক সংজ্ঞায় এই রূপান্তরকামী মানুষেরা যুগ যুগ ধরে সামাজিক বয়কটের শিকার। মালা চরিত্রটির মধ্য দিয়ে শিশিরকুমার দাশ বহু শতাব্দী ধরে ঘটে চলা সামাজিক বয়কটের শিকার এই মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতার প্রকাশ যেমন ঘটিয়েছেন তেমনি তাঁর উদার ও আধুনিক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা নাটক তথা রূপান্তকামী সাহিত্যের ইতিহাসে এই নাটক নিঃসন্দেহে একটি মাইলস্টোন।

ওই বছরই 'প্রমা' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'সলোমনের তরবারি'। এই নাটকে একবিংশ শতাব্দীতে নারী-পুরুষের অতি পরিচিত দাম্পত্য সমস্যার দিকটি যেমন ফুটে উঠেছে, পাশাপাশি ফুটে উঠেছে বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের ফলে একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবনে নেমে আসা ভয়াবহ অন্ধকারের চিত্রটিও।

কী স্বাধীনতা আমরা চেয়েছিলাম আর কী স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি! 'একদিন-একরাত' নাটকে তারই তুল্যমূল্য বিচার করেছেন শিশিরকুমার দাশ। কুম্ভ সেই প্রকৃত স্বাধীনতা প্রত্যাশী বিপ্লবীদের প্রতিনিধি, যে চেয়েছিল দেশের সঙ্গে মানসিকতারও সার্বিক উন্নতি। বিনিময়ে জুটেছে আশাহীনতা, সামাজিক অবক্ষয়। একটা গোটা দেশ খণ্ডিত হয়ে, দাঙ্গায় পর্যুদস্ত হয়ে, রক্তাক্ত হয়ে এসেছে সেই স্বপ্নের (দুঃস্বপ্নেরও) স্বাধীনতা। আর সেই রক্তাক্ত স্বাধীনতা আর কুম্ভ একাকার হয়ে সময়ের সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়ে পড়ে থেকেছে নিথর। মৃত্যুতেই প্রকৃত প্রেমের অবসান ঘটে না— এই গভীর সত্যই 'অন্ধ বুদ্ধ' নাটকের কেন্দ্রীয় বিষয়।

বাংলা গদ্যের বিকাশে দোম আন্তোনিও-র নাম সর্বাগ্রে উচ্চারিত হওয়ার দাবি রাখে। তাঁর জীবনের সমগ্র ঘটনাকে 'দোম আন্তোনিও' নাটকের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন শিশিরকুমার দাশ। এটি শিশিরকুমার দাশের দ্বিতীয় জীবনীমূলক নাটক (সক্রেটিসকেন্দ্রিক নাটক প্রথম)। সংলাপ ও প্রকরণের বৈশিষ্ট্যে নাটক হিসেবে লিখিত হলেও এর মধ্যে জীবনীমূলক উপন্যাসের সমস্ত গুণ ভীষণভাবে স্পষ্ট। এই নাটকের উল্লেখযোগ্য দিক নাট্যকারের ইতিহাস চেতনা। প্রায় চারশো বছর পূর্বের বাংলাদেশের সমাজ, পরিবেশ ও জনজীবনকে তিনি যে নিপুণতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তা তাঁর কল্পনা শক্তি ও প্রাজ্ঞ দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতাকে প্রমাণ করে। অতীতের ঘটনাকে অবলম্বন করে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ-কে এক সূত্রে গ্রন্থনই এই নাটকের মূল উপজীব্য।

'দিশা সাহিত্য' পত্রিকার ১৪০৭ শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত চার দৃশ্যের 'শকুন্তলা' নাটকে শিশিরকুমার দাশ কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'-এর বিনির্মাণ ঘটিয়েছেন। এই নাটকে শকুন্তলা এক প্রতিবাদী চরিত্র। যে আত্মসম্মানবোধে দীপ্ত, পুরুষ শাসিত সমাজের অপমান সে মুখ বুজে সহ্য করেনি। এই নাটকে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শকুন্তলা তাই হয়ে উঠেছে পুরোধা, নায়িকা। সেই সঙ্গে এই নাটক হয়ে উঠেছে প্রতিস্পর্ধার এক অনন্য ইস্তেহার।

পরের বছরই 'দিশা সাহিত্য' পত্রিকার ১৪০৮ উৎসব সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শিশিরকুমার দাশের ষষ্ঠ প্রহসন 'বিবাহ মণ্ডপ প্রহসন'। নারায়ণ ও নারদের নানা কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠানে বিস্তর হাস্য-কৌতুকময় পরিবেশের সৃষ্টি হয়। আপাতভাবে এটিই এই প্রহসনের মুখ্য বিষয় হলেও বাঙালি সংস্কৃতির বিবর্তনের চিত্রটি ফুটিয়ে তোলাও নাট্যকারের অন্যতম উদ্দেশ্য।

'বহুরূপী' পত্রিকার অক্টোবর ২০০১, ৯৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'মৌনভঙ্গ' নাটক। তিনটি দৃশ্যের সমাবেশে গঠিত এই নাটকের চরিত্র উমানন্দ ও নন্দলালের সঙ্গে 'একটি মৃত দেহ' নাটকের সন্দীপ ও অনিমেষ চরিত্রের কিছুটা মিল রয়েছে। নন্দলালের মৌনতা আসলে সত্য ঘটনা চাপা থাকার রূপক। আর উমানন্দের সেই সত্যতা সকলের কাছে প্রকাশ করার মধ্য দিয়ে অবসান ঘটেছে সেই মৌনতার। 'মৌনভঙ্গ' তাই হয়ে উঠেছে সত্য উদ্‌ঘাটনের নাটক।

'প্রমা' পত্রিকার ১৪০৮ ও ১৪০৯ শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় 'একটি কুকুর ও কয়েকজন মানুষ' এবং 'ভ্রাম্যমান'। 'দাদাজী, আমরা কোন্ পার্টির লোক' প্রকাশিত হয় ২০০৩ সালে 'এবং মুশায়েরা' পত্রিকার 'বাংলা উপন্যাস ও শিশিরকুমার দাশ' বিশেষ সংখ্যায়। তিনটি নাটকই শিশিরকুমার দাশের ছোটোগল্পের নাট্যরূপ। চার দৃশ্যের 'একটি কুকুর ও কয়েকজন মানুষ' নাটকটির সূচনা একটি স্কুলের সহকর্মীদের মধ্যে চলা বিতর্ককে কেন্দ্র করে। নাট্যকার একটি কুকুরকে মানুষের অমানবিক, অসহযোগী ও ক্ষমতালোভী সত্তার প্রতীক রূপে এখানে তুলে এনেছেন। 'ভ্রাম্যমান' নাটকের দু-জন মানুষ— একজন দেশ অপরজন বিদেশের বেশকিছু জায়গা বেড়ানোর অভিজ্ঞতা পরস্পরের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। এই নাটকে নির্মল ও ইন্দ্র চরিত্র দু-টির মধ্য দিয়ে মানুষের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতাকে রোমহর্ষক কাহিনির আশ্রয়ে শিশিরকুমার দাশ তুলে ধরেছেন। না-বেড়ানো মানুষরাও শুধুমাত্র দুর্দমনীয় ইচ্ছেয় ভর করে অনায়াসেই বহু স্থান ঘুরে বেড়াতে পারে। আবার অনেকেই আবার বহু জায়গা ঘুরে বেরিয়েও বিচিত্র অভিজ্ঞতায় জারিত হতে পারে না— প্রকৃত দেখার চোখ না থাকায়। এই বার্তাই এই একাঙ্ক নাটকের সার। 'দাদাজী আমরা কোন্ পার্টির লোক' নাটকে শিশিরকুমার দাশ প্রকৃত ভারতের চিত্র আঁকতে চেয়েছেন। মাঙ্গীরামেরাই আসলে সেই প্রকৃত ভারত; সেই পাগলা মেহের আলি! যুগে-যুগে অপরিবর্তনীয় যাদের ইতিহাস। নাম পরিচয়হীন, দিন বদলহীন, অস্তিত্বহীন এক দলীয় কর্মী। এই নাটক নাট্যকারের মনন চেনায়, মেজাজ চেনায়; পরিচয় দেয় সংবেদনশীল মনের, ইতিহাস ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গির।

শিশিরকুমার দাশের প্রয়াণের পর প্রকাশিত হয় 'বুড়োবাবা'। এই নাটকে বুড়োবাবা নামক একশো ষোল বছরের এক বৃদ্ধের মধ্য দিয়ে সংসারের বোঝা বয়স্ক মানুষদের অসহায়তার দিকটি মানবিক দৃষ্টিতে শিশিরকুমার দাশ ফুটিয়ে তুলেছেন।

চিত্রসূত্র

১. জানা যায়নি, "'কালচক্র' প্রযোজিত 'বাংলার মুখ' নাটকের একটি দৃশ্যের আলোকচিত্র", 'অরবিট উইকলি' (১ আগস্ট ১৯৭১), পৃ জানা যায়নি
২. জানা যায়নি, "সুরজিৎ ঘোষ পরিচালিত ও 'প্রমা' প্রযোজিত 'পুরস্কার প্রহসনম্' নাটকের একটি দৃশ্যের আলোকচিত্র", 'যুগান্তর' (রবিবার, ১ জুলাই ১৯৯০), পৃ ৪
৩. নিমাই ঘোষ, "কুমার রায় পরিচালিত ও 'বহুরূপী' প্রযোজিত 'শ্যামা' নাটকের একটি দৃশ্যের আলোকচিত্র", 'দ্য ইকনমিক্ টাইমস্ নিউ দিল্লি' (বৃহস্পতিবার, ২১ জুলাই ১৯৯২), পৃ ১০
৪. ওই, "কুমার রায় পরিচালিত ও 'বহুরূপী' প্রযোজিত 'আকবর-বীরবল' নাটকের একটি দৃশ্যের আলোকচিত্র", 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (১২ নভেম্বর ১৯৯৩), পৃ ৮
৫. অপূর্ব ব্যানার্জি, "কুমার রায় পরিচালিত ও 'বহুরূপী' প্রযোজিত 'সিন্দুক' নাটকের একটি দৃশ্যের আলোকচিত্র", 'আনন্দবাজার পত্রিকা' (৩০ ডিসেম্বর ১৯৯৫), পৃ জানা যায়নি
৬. পৃথ্বীরাজ রায়, "শামু গাঙ্গুলি পরিচালিত ও 'বিকল্প' প্রযোজিত 'খেলা' নাটিকার একটি দৃশ্যের আলোকচিত্র", 'দ্য স্টেটস্‌ম্যান' (২৭ এপ্রিল ১৯৯৮), পৃ ১৪
৭. সুচারু দাস, "'পুরুষ পুরুষ কর্ছ কারে' নাটকের একটি দৃশ্যের অলঙ্করণ", 'প্রমা' (ফেব্রু-মার্চ ১৯৯৭), পৃ ৮১
৮. দেবাশিস দাশ, "'শকুন্তলা' নাটকের একটি দৃশ্যের অলঙ্করণ", 'দিশা (সাহিত্য)' (শারদীয় ১৪০৭), পৃ ৬১
৯. ওই, 'বিবাহ মণ্ডপ প্রহসন'-এর একটি দৃশ্যের অলঙ্করণ', "দিশা (সাহিত্য)" (উৎসব সংখ্যা ১৪০৮), পৃ ২০

তৃতীয় অধ্যায়

শিশিরকুমার দাশের প্রবন্ধ: বোধিচর্চার বহুমাত্রা

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় প্রাবন্ধিক হিসেবে শিশিরকুমার দাশের পরিচিতি ও স্বীকৃতি সর্বাধিক। জ্ঞানকে কখনও তিনি নির্দিষ্ট সীমায় বেধে রাখেননি। শিশিরকুমার দাশ তাই অনায়াসে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য নিয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। সাহিত্য ও সংস্কৃতির একেবারে শিকড়ে পৌঁছে তুলে আনতে পারেন তত্ত্ব ও তথ্যের নানা উপকরণ।

বাংলা ও ভারতের প্রেক্ষাপট ছাড়িয়ে প্রাবন্ধিক শিশিরকুমার দাশ বিদেশি সাহিত্য নিয়েও তাঁর মতামত ভাগ করে নেন সমানভাবে। শিশিরকুমার দাশের ভাবনার গভীরতায়, অসামান্য বর্ণনাগুণে সমস্ত চিন্তকেরা, সাহিত্যিকেরা তাঁদের দর্শন নিয়ে তাই আরও বেশি করে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন। শিশিরকুমার দাশের ভাবনা-জালের এক একটি সুতো রক্তবীজের মতো সৃষ্টি করে আরও বহু ভাবনা-জাল, আলোচনার পথ।

যে কোনো ভাষার সূচনার ক্ষেত্রেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেই ভাষায় ব্যবহিত শব্দ, শব্দের ভান্ডার। তাই শিশিরকুমার দাশের প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনার শুরুতে প্রথমেই নজর ফেলা 'বাংলা শব্দের ইতিহাস' প্রবন্ধটির দিকে। আদপে তিনি এই প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে শব্দের ইতিহাস লেখার একটা প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করতে চেয়েছেন। যেহেতু এই প্রবন্ধ বাংলা শব্দের একটি দীর্ঘ ইতিহাস রচনার প্রস্তাবনা তাই, প্রবন্ধের শেষে তিনি আশা ব্যক্ত করে লেখেন, 'এই সুপবিত্র কাজে যিনি অগ্রসর হবেন তিনিই জাতির ধন্যবাদার্হ। বাংলা শব্দের ইতিহাস রচিত হোক এই আশা নিয়ে এই প্রস্তাব করা হল।'[১] 'কাব্যের আদিম গর্ভে' নামক একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধে তিনি প্রাচীন সাহিত্যে কবিদের কবিতার ছদ্মবেশে নানা ধর্ম কথা বিশ্লেষণের প্রবণতার দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। এই প্রবন্ধের দীর্ঘ যাত্রা পথে উঠে এসেছে প্রাচীন কবিদের ঈশ্বর নির্ভরতার বিপক্ষে অরণ্য, প্রকৃতি নির্ভরতার কথা। শিশিরকুমার দাশের ভারত-চেতনার বিস্তার লক্ষ্য করা যায় 'চৈতন্যদেব' প্রবন্ধে। চৈতন্যদেব সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি চৈতন্যদেবকে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমায় আবদ্ধ রাখেননি। সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটের নিরিখে একজন সন্ত হিসেবে তাঁকে ব্যাখ্যা করেছেন। চৈতন্যদেবের মধ্যে যে কৃষ্ণ-বিরহভাব ধ্বনিত হয়েছিল তাঁকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন বহু সন্তের সম্মিলিত কণ্ঠস্বরের প্রতিধ্বনি হিসেবে। শিশিরকুমার দাশ তাই চৈতন্যদেবকে সমস্ত সাধকসত্ত্বার প্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরেন।

টালমাটাল পায়ে পথে চলে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ বাংলা গদ্যের বিকাশের ধারায় যে স্রোত বয়ে আনে, রামমোহনের হাত ধরে তা আরও তরান্বিত হয়ে ওঠে। ফোর্ট উইলিয়াম

কলেজের সঙ্গে যুক্ত না থেকেও সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে রামমোহন বাংলা গদ্যকে প্রথম যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলেন। শিশিরকুমার দাশ 'রামমোহন রায়ের বাংলা গদ্য' ও 'রামমোহনের ভাষাচিন্তা' প্রবন্ধে বাংলা গদ্যের বিকাশে রামমোহনের অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে।

'বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮০১-১৮৫০' প্রবন্ধে শিশিরকুমার দাশ বাংলা গদ্যে যতি চিহ্ন ব্যবহারের ইতিহাসটিকে পর্যায়ক্রমিকভাবে তুলে ধরেছেন। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষায় প্রথম ইংরেজি যতিচিহ্নের ব্যবহার করেন— শিশিরকুমার দাশ বাংলা গদ্যে ইংরেজি যতিচিহ্ন ব্যবহারের ইতিহাস তুলে ধরে চিরাচরিত এই ধারণাকে নস্যাৎ করেছেন।

বিদ্যাসাগরের মতো একজন বর্ণময় ব্যক্তিত্বকে তুলে ধরতে গিয়ে শিশিরকুমার দাশ শুধুমাত্র তাঁর সাহিত্যিক কর্মকাণ্ডের দিকেই নজর রাখেননি। একজন সচেতন গবেষকের দৃষ্টিতে তাঁর সমগ্র জীবনব্যাপী কর্মধারাকেই তিনি ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন। শিশিরকুমার দাশের 'সিংহশিশু' গ্রন্থটিতে বিদ্যাসাগরকেন্দ্রিক তাঁর ভাবনার একটা সমগ্রতার চিত্র পাওয়া যায়। তাঁর 'নারীপ্রশ্ন' প্রবন্ধটি বিদ্যাসাগরকেন্দ্রিক ভাবনা ও চর্চার জগতে সংযোজন করেছে ভিন্ন মাত্রা। 'ইংরেজি, সংস্কৃতি ও ইংরেজিয়ানা' প্রবন্ধটি শিক্ষা-ব্যবস্থা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের নতুন চিন্তাধারার স্মারক হয়ে আছে। শিশিরকুমার দাশের 'বিদ্যাসাগর ও ধর্মহীন জীবন' প্রবন্ধে উঠে এসেছে উনিশ শতকের একমাত্র ধর্ম নিরপেক্ষ চরিত্র বিদ্যাসাগরের কথা। বাংলা গদ্যের বিকাশের ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের পরই যে নামটি উঠে আসে তিনি আবশ্যিকভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে শিশিরকুমার দাশ বিভিন্ন সময়ে দীর্ঘ আলোচনার পরিসর ব্যয় করেছেন। তাই 'বঙ্কিমচন্দ্র: হিন্দুত্ব ও সাম্প্রদায়িকতা', 'মৃত্যু সিংহাসনে', বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভৌগোলিক পরিধি নিয়ে একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের

বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা গদ্য পরিণত হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র যে রোমান্সের সৃষ্টি করেন তাকে যুগোপযোগী এবং নিগূঢ় জীবনসত্য দ্বারা সৃষ্ট বলে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্কিমের উপন্যাসে সময়ের পরিধিকে নতুন মানদণ্ডে বিশ্লেষণ করেছেন প্রাবন্ধিক। তাঁর মতে, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যে ভৌগোলিক বিস্তৃতিকে তুলে এনেছেন তা তাঁর সুদূরচারিতা ও রহস্য রোমান্সের অনুষঙ্গকে বহন করে। 'মৃত্যু সিংহাসনে' প্রবন্ধে শতবর্ষ পেরিয়ে এসেও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক গুরুত্বের কথা প্রাবন্ধিক নিঃসংশয়ে স্বীকার করেছেন। বাংলা গদ্যের একটা সার্বিক রূপ দান, উনিশ শতকের সামাজিক প্রেক্ষাপটে বাঙালিকে দেশাত্মবোধে জারিত এবং নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি আস্থাশীল করে তুলতে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'The Artist In Chains: The Life of Bankimchandra Chatterjee' গ্রন্থের ভূমিকা অংশে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর সামগ্রিক ভাবনার একটা সারাৎসারের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লেখেন—

> "But his was a silent struggle, a struggle between two ways of thought: that of the traditional Hindu and that of the Hindu changing under the

impact of the West, two cultures and tastes, indigenous and foreign, individual freedom and social authority.[২]

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক কয়েকজন লেখক নতুন কিছু সৃষ্টির চেষ্টায় মেতে ওঠেন। সৃষ্টি হয় বাংলা ছোটোগল্পের প্রেক্ষাপট। শিশিরকুমার দাশের গবেষণা গ্রন্থ 'বাংলা ছোটগল্প' এই ছোটোগল্পের গড়ে ওঠা ও ইতিহাসকে কেন্দ্র করেই।

'মাইকেল মধুসূদন ও আমাদের সাড়া' প্রবন্ধ ছাড়াও 'মধুসূদনের কবিমানস' নামক একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থকে কেন্দ্র করে উনিশ শতকের অন্যতম বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব মাইকেল মধুসূদন দত্তকে ঘিরে শিশিরকুমার দাশের ভাবনার পরিধি বিস্তার লাভ করেছে। শিশিরকুমার দাশ তাঁর মধুসূদনকেন্দ্রিক আলোচনার পরিসরে তাঁকে শুধুমাত্র একজন কবি হিসেবেই উল্লেখ করেননি। মধুসূদনের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন নব জাগরণের অন্তদ্বন্দ্বের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য।

মধুসূদনকেন্দ্রিক আলোচনা প্রসঙ্গেই শিশিরকুমার দাশ তাঁর গবেষণার পরিসরকে রবীন্দ্রনাথে নিয়ে গেছেন। 'দুই কবি' অংশে তিনি লিখছেন, 'মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশ হয় ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে। সে বছরই রবীন্দ্রনাথের জন্ম। এই আকস্মিক ঘটনা দুটিকে বিশেষ তাৎপর্যময় বলে মনে হয় আমার। একজনের হাতে নবীন বাংলার আত্মার প্রথম প্রকাশ, অন্যজনের হাতে তার জন্মজন্মান্তরের সার্থকতা;...'।[৩] মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য দর্শনের কাছাকাছি পৌঁছতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের কাছেই কাব্য রচনার আদর্শ পেয়েছিলেন। শিশিরকুমার দাশের আলোচনায় এই মন্তব্যের সাপেক্ষে যুক্তিগ্রাহ্যমূলক ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। আসলে দুই কবির মধ্যে শিল্প ও দর্শনগত তুলনার মধ্য দিয়ে তিনি একটা বিস্তীর্ণ প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রনাথের কবিমানসটিকে বুঝতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা বাংলা সাহিত্যে এক অন্যতম মাইলস্টোন। শিশিরকুমার দাশ 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতার উৎস' ও 'রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা ও গদ্য' প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের এই নতুন কাব্যরীতি বিষয়ে বিশদে আলোকপাত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতা সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তার সূত্র ধরেই গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্বকেন্দ্রিক ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায় 'গদ্য ও পদ্যের দ্বন্দ্ব' বইটিতে। গদ্য ও পদ্যের মধ্যে যে চিরাচরিত দ্বন্দ্ব তা আলোচিত হয়েছে আরও বিস্তৃত প্রেক্ষাপটে। নানা তথ্য ও উদাহরণের সহায়তায় তিনি প্রমাণ করতে চেয়েছেন গদ্য ও পদ্যের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব থাকলেও তা অনেক ক্ষেত্রেই মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। রীতিগত দিক থেকেই তাদের মধ্যে কেবল তারতম্য বজায় থেকেছে।

'আধুনিক কবিতা: রীতি ও চিন্তা' প্রবন্ধে বাংলা আধুনিক কবিতার সূচনা ও বিবর্তন প্রসঙ্গে তাঁর মত, ইংরেজি সাহিত্যে আধুনিক কবিতার সূচনা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়েই ঘটলেও বাংলা সাহিত্যে তার ঢেউ এসে পৌঁছোয় অনেক পরে। আধুনিক বাংলা কবিতার অপর এক বিস্ময় জীবনানন্দ দাশ। তাঁর কবিতার রীতি ও চিন্তা নিয়ে শিশিরকুমার দাশ মোট তিনটি প্রবন্ধে

বিস্তারিত আলোচনা করেছেন— 'আমার পায়ের শব্দ শোনো: ঝরাপালক থেকে ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'জীবনানন্দ: ব্যক্তিগত অনুভূতি থেকে', 'কবিতার ভাষা: জীবনানন্দ'। জীবনানন্দ পরবর্তী কবিদের মধ্যে 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা' প্রবন্ধে তাঁর কবিতা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন ইতিহাসচেতনা। জীবনানন্দের কবিতায় যে জীবনবোধ ক্রিয়াশীল ছিল তা পরবর্তী সমস্ত কবির কাব্যেই গভীরতর হয়েছে। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমগ্র কাব্যধারার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন এমন এক জীবনানুভূতি যা শেষ পর্যন্ত একটি জীবনমোহনায় পৌঁছে পরিণতি লাভ করেছে।

কবি ও কবিতার বিস্তীর্ণ জগৎ ছেড়ে শিশিরকুমার দাশ আধুনিক কথাসাহিত্যিক ও তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য নিয়েও বিস্তর আলোচনা করেছেন। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি', 'আরণ্যক: ভারতবর্ষ কোন্ দিকে?', 'ইছামতী: প্রতিবাদী-ঐতিহাসিক উপন্যাস', 'মৃগয়ার চার কথক' ছাড়াও 'তাঁরাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও আমাদের কথাসাহিত্য' প্রবন্ধে তাঁর কথাসাহিত্যকেন্দ্রিক প্রজ্ঞার ছাপ ফুটে ওঠে। তারাশঙ্করের ক্ষেত্রে তিনি বেছে নিয়েছেন সামগ্রিক মূল্যায়নের পথ। তারাশঙ্করের রচনার বৈচিত্র্য, বিষয়বস্তুর অজস্রতা, চরিত্র নির্মাণের নৈপুণ্য, পটভূমির বিশালতার থেকে তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও কথাসাহিত্যে বিশেষ রূপ সৃষ্টির প্রয়াসকে শিশিরকুমার দাশ অধিক তাৎপর্যপূর্ণ মনে করেছেন। বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্করের প্রায় সমসাময়িক সাহিত্যিক হলেও বিষয়-বৈচিত্র্যে বনফুল ছিলেন সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। 'মৃগয়ার চার কথক' প্রবন্ধে শিশিরকুমার দাশ বনফুলের এক অনন্য সৃষ্টি 'মৃগয়া' উপন্যাসটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আশাপূর্ণা দেবীর প্রতিনিধিমূলক উপন্যাস 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নিয়ে শিশিরকুমার দাশ দীর্ঘ আলোচনা করে উপন্যাসটির তাত্ত্বিক গুরুত্বকে ভিন্ন মাত্রায় নিয়ে গেছেন।

সাহিত্য ব্যতীত ভাষাতত্ত্বের ওপরেও শিশিরকুমার দাশের বেশ দখল ছিল। 'আলেকজান্ডার ও পুরু', 'মোদের গরব মোদের আশা' প্রবন্ধগুলি ছাড়াও 'ভাষা জিজ্ঞাসা' পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থে তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক প্রজ্ঞার পরিচয় মেলে। 'ভাষা জিজ্ঞাসা' বইটির ভূমিকায় শিশিরকুমার দাশ বলেছেন, সাধারণ শিক্ষিত ও ভাষাবিজ্ঞানে উৎসাহী পাঠকদের উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থটির নির্মাণ। কিন্তু তাঁর এই বক্তব্যের মধ্যে নিঃসন্দেহে একটা স্ববিরোধিতা আছে। বইটি পাঠের পর সহজেই অনুমান করা যায়, এই গ্রন্থ বিশেষজ্ঞদের কাছেও বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। গ্রন্থটিতে ভাষাতাত্ত্বিক শিশিরকুমার দাশ ভাষাতত্ত্বের ক্ষেত্র, পরিধি এবং তত্ত্বগত সমস্যা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার পরিধিতে উঠে এসেছে সোসিওলিঙ্গুয়িস্টিক্স, স্টাইলিস্টিক্স, স্ট্রাকচারালিজ্‌ম, ফরমালিজ্‌ম, ক্রিটিকাল লিঙ্গুয়িস্টিক্স ইত্যাদি বিষয়।

বাংলা সাহিত্যের পরিসর ছেড়ে শিশিরকুমার দাশ আলোচনার বিস্তৃতিকে নিয়ে গেছেন সর্বভারতীয় স্তরে। 'ভারতীয় সাহিত্যের সংরচনা', 'কে মেরেছে কে বকেছে কে দিয়েছে গাল', 'ভারতীয় রাজনৈতিক উপন্যাস'-এর মতো প্রবন্ধগুলির পাশাপাশি 'ভারতসাহিত্যকথা' নামক একটি শীর্ণকায় গ্রন্থে ভারতীয় সাহিত্য সংক্রান্ত তাঁর ভাবনা-চিন্তার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শিশিরকুমার দাশের এই বিকল্পহীন অনবদ্য সৃষ্টি সম্পর্কে শঙ্খ ঘোষের মন্তব্যটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। শঙ্খ ঘোষ লিখেছেন,

> "ভাবীকালের পাঠকসমাজ বহুদিন ধরে কৃতজ্ঞ থাকবে শিশিরকুমার দাশের কাছে তাঁর সাবলীল এই 'লিভিং অ্যাকাউন্ট'-টির জন্য। দেশ আর তার সাহিত্যের বিষয়ে আমাদের অজ্ঞতার পরিমাণ যে কী ভয়াবহ রকমের প্রকাণ্ড, এ-বই হাতে নিলে সেটা আমরা মুহুর্মুহু টের পাব বলে মনে হয়।"[৪]

এই মন্তব্যের মধ্যেই শিশিরকুমার দাশের ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত যাবতীয় কীর্তি ও অবদানের খুঁটিনাটির বৃত্তান্তটি নিহিত।

বিশ্বসাহিত্য নিয়ে শিশিরকুমার দাশের পাণ্ডিত্য ছিল গগনস্পর্শী। তাঁর অসংখ্য প্রবন্ধ ও গ্রন্থগুলিকে মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে বাংলা ও ভারতীয় সাহিত্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্য সাহিত্য নিয়েও তিনি একটি ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। এই ইতিহাস হয়তো তিনি সচেতনভাবে লিখে যেতে চাননি। কিন্তু তাঁর বিভিন্ন ছড়ানো-ছিটোনো প্রবন্ধগুলিকে সময়ের ক্রম অনুসারে সাজিয়ে পাঠ করলে দেখা যাবে, তা অনায়াসেই একটি সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য সাহিত্য ইতিহাসের রূপ গ্রহণ করছে।

প্রবন্ধগুলিকে সময়ের নিরিখে সাজালে প্রথমেই প্রাচীন গ্রিসের অন্যতম গীতি কবি সাফোর প্রসঙ্গ উঠে আসে। 'সাফো' ও 'এখনও উজ্জ্বল সেই অগ্নিশিখা'— এই দু-টি প্রবন্ধে সাফোকে নিয়ে তাঁর যাবতীয় দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় প্রকাশিত হয়েছে।

গ্রিসের আধুনিক কবি সেফেরিসকে নিয়েও তাঁর ভাবনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়। এই আধুনিক গ্রিক কবির কবিতা তিনি বাংলায় অনুবাদও করেছেন। 'জর্জ সেফেরিসের নির্বাচিত কবিতা' নামে তা সাহিত্য অকাদেমি থেকে প্রকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থের ভূমিকায় জর্জ সেফেরিসকে নিয়ে শিশিরকুমার দাশের বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। যার মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে সেফেরিসের সময়-সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নানা উত্থান-পতনের কাহিনি।

শিশিরকুমার দাশের আলোচনায় উঠে আসে ইংরেজি সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্যিক লুইস ক্যারলের প্রসঙ্গ। তাঁর কীর্তি ও পরিচিতির মূল সূত্রটি নিহিত রয়েছে 'অ্যালিস ইন দি ওয়ান্ডার ল্যাণ্ড' গ্রন্থটির মধ্যে। শিশিরকুমার দাশ তাই এই গ্রন্থটিকে ঘিরেই তাঁর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু সীমাবদ্ধ রেখেছেন। লুইস ক্যারলের মন্তব্য তুলে ধরে শিশিরকুমার দাশ স্বার্থশূন্য ভালোবাসার মধ্যেই এই গ্রন্থ নির্মাণের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর এই

আলোচনার মধ্য দিয়ে 'অ্যালিস ইন দি ওয়ান্ডার ল্যাণ্ড' গ্রন্থটির নবমূল্যায়নের সম্ভাবনা যেমন তৈরি হয়েছে তেমনি নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে চার্লস লাটউইগ ডজসন অর্থাৎ লুইস ক্যারল বাঙালি পাঠকের দরবারে হাজির হয়েছেন।

'বার্ট্রাড রাসেলের ছোট গল্প' আলোচনায় শিশিরকুমার দাশ তাঁর গল্পে খুঁজে পেয়েছেন আধুনিক সভ্যতার নানা সমস্যার বিশ্লেষণ।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক আলোচনার পরিসর ছেড়ে শিশিরকুমার দাশ 'ইংরেজি কবিতা ১৯৪০-১৯৬০' প্রবন্ধটিতে দু-দশকের ইংরেজি কবিতার বাঁকবদল, দর্শনের যাবতীয় পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরেছেন। পাশাপাশি এই দু-দশকে ইংরেজি কবিতায় যে সমস্ত কবিদের আর্বিভাব ঘটেছিল বা যে সমস্ত কবিরা একটা স্বাতন্ত্র্য স্থান দখল করতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁদের সম্পর্কে একটা সংক্ষিপ্ত ধারণা তৈরির তিনি চেষ্টা করেছেন।

তথ্যসূত্র

১. শিশিরকুমার দাশ, "বাংলা শব্দের ইতিহাস", 'অধুনাতন' (১৩৬৭), পৃ ১৬০

২. Sisir Kumar Das, 'The Artist in Chains: The Life of Bankimchandra Chatterji', 1st Edition, New Delhi, New Statesman Publishing Company, 1984, Pg (Introduction) x

৩. শিশিরকুমার দাশ, "দুই কবি", 'মধুসূদনের কবিমানস', ১ম এবং মুশায়েরা সং, কলকাতা, এবং মুশায়েরা, নভেম্বর ২০১৩, পৃ ১০১

৪. শঙ্খ ঘোষ, "গ্রন্থ সমালোচনা", 'আজকাল', ৪ জানুয়ারি ১৯৯৪, পৃ বইপড়া

চতুর্থ অধ্যায়

শিশিরকুমার দাশের কথাসাহিত্য ও অন্যান্য আখ্যানধর্মী রচনা: সময়, সমাজ ও দর্শন

কৈশোর থেকেই কবিতা লেখার পাশাপাশি সমান তালে বিভিন্ন ধরনের গদ্য রচনার মহড়া চলত। বারো-তেরো বছর বয়সেই তাঁর সামাজিক সত্য, দেশ ও জনগণের প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করার ক্ষমতা গড়ে উঠেছিল। 'দেওয়ালী উৎসব' নামের মুক্ত গদ্যটিতে তাঁর এই সমাজ বাস্তবতার পরিচয় ফুটে ওঠে।

১৯৫৭ সালে 'প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা'-য় 'কলেজ স্ট্রীট' নামে একটি ভিন্ন স্বাদের রচনা প্রকাশ পায়। এই রচনার মধ্য দিয়ে গদ্যকার হিসেবে শিশিরকুমার দাশ নতুন হয়ে দেখা দেন। পরিচিত গদ্যের প্যাটার্নে নিয়ে আসেন অনন্যতা।

গদ্যরচনার এই মকশো পেরিয়ে শিশিরকুমার দাশ এবার চোখ ফেরালেন গল্প রচনায়। মূলত পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে গল্প লেখার মনোযোগী প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। জীবনের নানা অভিজ্ঞতাকে সম্বল করে কল্পনা ও বাস্তবের নানা মিশেলে তিনি একের পর এক ছোটোগল্প বুনে গেছেন। মাত্র ষোলো বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম ছোটোগল্প 'প্লাবন'। এরপর 'দেশ', 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'অমৃত', 'নববাণী' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন স্বাদের ছোটোগল্প প্রকাশ পেতে শুরু করে। ছেষট্টি বছরের জীবৎকালে তাঁর লেখা ছোটোগল্পের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি। শেষ ছোটোগল্প 'পুরনো বই' প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে 'দিশা' পত্রিকায়। অর্থাৎ তাঁর ছোটোগল্পগুলি প্রায় পাঁচ দশক সময়কালের সাক্ষী, সাক্ষী পাঁচ দশকের দিন বদলের। কৈশোরের প্রথম লগ্ন থেকে জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত শিশিরকুমার দাশের ভাবনা, দর্শন ও মননের যে বাক্‌বদল ঘটে চলছিল তার স্পষ্ট সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এই সমস্ত গল্পগুলি। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তাঁর গল্প বলার ঢঙে বিস্তর পরিবর্তন ঘটেছে। চরিত্র সৃষ্টিতে এসেছে সাবলীলতা। মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন ক্রমশ দৃঢ় থেকে হয়েছে দৃঢ়তর। কৈশোরের প্রথম লগ্নের গল্পগুলিতে ভাবনার যে অসংগতি ছিল তা পরবর্তীতে অভিজ্ঞ লেখনী গুণে হয়ে উঠেছে মার্জিত ও মনোমুগ্ধ।

শিশিরকুমার দাশ যে সময় গল্প লিখতে এলেন সেই সময় বাংলা ছোটোগল্পের রাজপথে চলছে প্রতিভার মিছিল। পরশুরাম অস্তগামী সূর্য, মানিক-তারা-বিভূতি, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বনফুলদের মধ্য দিয়ে বাংলা ছোটোগল্পের যুগান্তকারী সৃষ্টিগুলি ইতিমধ্যেই ঘটে গেছে। দাপিয়ে বেরাচ্ছেন সুবোধ ঘোষ, সন্তোষকুমার ঘোষ, সমরেশ বসু, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ও জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী গোষ্ঠী। পাল্লা দিয়ে চলেছে বাংলা ছোটোগল্পের ফর্ম নিয়ে নানা সফল পরীক্ষা-

নিরীক্ষা। এই শোভাযাত্রায় গল্পকার হিসেবে শিশিরকুমার দাশ অনেকটাই ম্লান। এর অন্যতম কারণ, সৃজনশীল সাহিত্যের তুলনায় তাঁর পরিচিতির পাল্লা ভারি হয়েছিল প্রাজ্ঞ গবেষক হিসেবে। গভীর পাণ্ডিত্য ঢেকে রেখেছিল তাঁর সৃজন প্রতিভা। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনিয়মিত ছোটোগল্পকার হিসেবে শিশিরকুমার দাশের লেখনীর ব্যাপ্তি পাঠককে একেবারেই হতাশ করে না। বরং কিছু গল্প নিঃসন্দেহে শিহরণ জাগায়, নতুন ভাবনার আলোয় জারিত করে।

শিশিরকুমার দাশের ছোটোগল্পগুলি ধারাবাহিকভাবে সমাজ, মানুষ, সম্পর্ক, মানুষের মনস্তত্ত্বের পরিবর্তন— সমস্তকিছুর এক নীরব সাক্ষী। দশক ধরে ধরে সময় ক্রমাগত মিশেছে গল্পগুলির শরীরে। বৃহস্পতির গায়ে হঠাৎ পড়া রেড স্পট লাইটের মতো জারি রেখেছে অন্বেষণ; আত্ম ও জাগতিক। মাটি ও হওয়ার বিশ্লেষণে গল্পগুলিতে তৈরি হয়েছে নতুনের সম্ভাবনা। অন্ধকার কোথাও আচ্ছন্ন করেছে, কোথাও আবার আলোর লসাগু-গসাগু ভেঙেছে সিঁড়ি— বদলে বদলে গেছে সমস্ত হিসেব ও নিকেশ। পরতে পরতে জমা হওয়া শিশিরকুমার দাশের সমস্ত দর্শন— মলিন ও উজ্জ্বল প্রগাঢ় সম্ভাবনায় জারিত করে রেখেছে একটা বিস্তৃত আগামী।

১৯৬০ সালে প্রকাশিত হয় শিশিরকুমার দাশের প্রথম উপন্যাস ‘নীলসমুদ্র’। এটি এক প্রজ্বলন্ত সময়ের অসামান্য নির্মাণ। এই নির্মাণ কাহিনির সঙ্গে কাহিনি জুড়ে, এই নির্মাণ অস্তিত্বের সঙ্গে সংকট জুড়ে। আশোক; শিক্ষিত, প্রত্যাশিত, সম্ভাবনাময়, আত্মমর্যাদা সম্পন্ন এক যুবক। এই অশোক-সুতোর এক-একটি গিঁট তার মা সুরধুনী, বোন লীলা ও প্রেমিকা করবী।

সমগ্র উপন্যাসটি যে সমস্ত খণ্ড চিত্রের সমাবেশে ঔপন্যাসিক গড়ে তুলেছেন তার মধ্য দিয়ে হুরমুরিয়ে কয়েকটা দশক, কয়েকটা দশকের সামাজিক অবক্ষয়— ফলাফল, মূল্যবোধ যেন নিজেদের অস্তিত্বকে, ক্ষতের গভীরতাকে জানান দিয়ে যায়। পঞ্চাশের দশকের যে সামাজিক অবক্ষয় মানুষের দুর্বিসহ টিকে থাকাকে চরম পরিহাস করছিল তার অন্যতম কারণ, নতুন সমাজ গঠনের প্রয়াস। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে শরনার্থী ঢেউ তখনও এসে চলেছে ক্রমশ। নিজস্ব ভিটে-মাটি, সোনা-ধান জমি, রূপালি নদীর দেশ তারা পেছনে ফেলে সাময়িক ঝুটো দেশ গড়ে তুলেছিল শেয়ালদহ চত্বরে। অশোকও এই নির্মম দেশভাগের শিকার। সকলের মতো তার মাকেও চলে আসতে হয়েছিল সব ছেড়ে, সব ফেলে। একটি পরিবারের সমস্ত সম্বল খুইয়ে অজানায় ভেসে পড়া, ডুবে ভাসতে চাওয়া, ডুবতে ডুবতেও সহায় সম্বলহীন খড়কুটোটুকু আঁকড়ে বাঁচতে চাওয়ার এক মর্মন্তদ আখ্যান হয়ে ওঠে এই উপন্যাস।

প্রথম উপন্যাস প্রকাশের ঠিক পরের বছর ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় শিশিরকুমার দাশের দ্বিতীয় উপন্যাস ‘সীমান্ত’। তিনি তখন টাকী কলেজ থেকে বদলি হয়ে এসেছেন ঝাড়গ্রাম রাজ কলেজে। চারিদিকে অরণ্য ঘেরা শান্ত পরিবেশ। এখানকার এই অরণ্য প্রেক্ষাপটকে কেন্দ্র

করেই এই উপন্যাসের কাহিনি বিস্তার লাভ করেছে। কাহিনি ভাবনার নতুনত্বে ও দার্শনিক ভাবনা প্রক্ষেপণে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস ‘সীমান্ত’-তেও প্রথম উপন্যাসের চেনা স্বরটি অনায়াসেই ফুটে ওঠে। দ্বিতীয় উপন্যাসটি যেন প্রথম উপন্যাসেরই ধারাবাহিক দ্বিতীয় পর্যায়। পঞ্চাশের দশকের ঝরা সময়ের যে সামাজিক ভয়াবহতা মানব অস্তিত্বকে সম্পূর্ণরূপে নিঙড়ে একশা করে তুলেছিল, অস্তিত্বের হাড়-মজ্জা বের করে মানবিক বোধকে করে তুলেছিল কঙ্কালপ্রায়, তারই বয়ান অশোকের বদলে দীপক চরিত্রের মধ্য দিয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে এই উপন্যাসে।

সময় অস্থির। অস্থির সমাজ, দেশ, কাল, আবহাওয়া। চরম এক অস্থিরতা মানুষের স্বাভাবিক ভাবনা ও ভাবনার পরিধিকে ক্রমশ স্থবির করে তুলছিল। তারিখ পেরোনো ওষুধের মতো ভয়াবহ বিষক্রিয়া ছড়িয়ে পড়ছিল গোটা সমাজ জুড়ে। মানবিকতা নেই, সহমর্মিতা নেই। ‘ক্রাইসিস’-এর অসংখ্য প্রকারভেদের মধ্যে সবচেয়ে জোরালো হয়ে দেখা দিতে শুরু করে ‘আইডেন্টিটি’। মতি নন্দীর ‘নক্ষরের রাত’ থেকে যে রীতির পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু তা ক্রমেই বুদ্ধদেব বসুর ‘লালমেঘ’, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ‘অন্তঃশীলা’ ও সতীনাথ ভাদুরীর ‘জাগরী’-তে পৌঁছে নিজের রীতিকে শক্তিশালী করে তোলে। তবে এ সমস্ত প্রয়োগের পূর্বেই ১৯৬১ সালে শিশিরকুমার দাশের ‘সীমান্ত’ উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ঘটে যায় এই রীতির সার্থক মহড়া। সমগ্র উপন্যাসের সূচনা থেকে পরিসমাপ্তি পর্যন্ত দীপক নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু চেতনা পাঠককে বিভোর করে রাখে। এই মৃত্যু চেতনাকে কেন্দ্র করে দীপকের হৃদয় তলে জমা হয় হাজার অসংলগ্ন ভাবনা। দীপক প্রহর গোনে— আর বেশি দিন নয় তার এই ক্ষোভময় বেঁচে থাকা। সব কিছু থাকে— সম্পর্ক, প্রেম, বন্ধুত্ব, সম্ভাবনা, আলো; অথচ তারপরেও যেন ‘কিছু নেই’, ‘কিছু নেই’ বিষাদ। যা কিছু পড়ে থাকে তা শুধুই ফুরিয়ে যাবার অপেক্ষায়। এক চরম বিমূঢ়তা আচ্ছন্ন করে রাখে দীপকের সমস্ত সত্তা। সমাজের মেকি কৃত্তিমতা, ভণ্ডামি— যা কিছু যুগের কাছে নিয়মবদ্ধ তাকে মেনে নিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক যাপনের সম্ভাবনা দৃঢ় হয় না সকলের; দীপকেরও। আত্মচৈতন্যের জাগরণ তার সমস্ত সম্ভাবনাকে নিয়ন্ত্রণ করে। মানুষ হয়ে ওঠে ক্রমশ গ্রিক নাটকের সেই ভাগ্যের উপর চূড়ান্ত নির্ভরশীল ট্র্যাজিক নায়কের মতো— সমাজ-জীবন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। তাই নিজের অস্তিত্বকে, জাগতিক সমস্ত কিছু থেকে নিজেকে বিযুক্ত করাই হয়ে ওঠে একমাত্র অবলম্বন। দীপকও তাই ক্রমাগত একলা থেকে একলা হয় (নিজের মুদ্রা দোষে?)। স্বাভাবিকতার যাবতীয় সংজ্ঞার প্রতি তৈরি হয় এক অজানা বিরক্তি।

যা কিছু তার পাওয়ার ছিল, দেওয়ার ছিল তার হিসেব মেলে না কিছুতেই। কাটাকুটির পর কাটাকুটি। সাপ-লুডো খেলার মতো নিরানব্বইয়ের ঘরে পৌঁছে ক্রমাগত ফিরে ফিরে আসা প্রথম বিন্দুতে। আবার শুরুর শুরু— আত্মমূল্যায়ণ, আপসোস, অতীতের পায়ে মাথা ঠুকে মরা। মরা-বাঁচা কিংবা মরে বাঁচতে চাওয়ার আহুতি দীপক উপেক্ষা করতে পারে না। সময়ের সীমান্তে দাঁড়িয়ে তাই অপূর্ণ প্রত্যাশাখণ্ডগুলি ফিরে ফিরে আসে। এই জীবনোপলব্ধিটুকুই দীপকের

অস্তিত্বের সার, জীবনের সার। দীপক ও সময় একই সিংহাসনের দুই রাজা— অনবরত টানাপোড়েনই তাদের নিয়ন্তা। উভয়েই লুপ্ত সমস্ত সভ্যতার শেষটুকু।

সাহিত্য রচনার প্রথম পর্বে অসংখ্য ছোটোগল্প ও দু-টি উপন্যাস লেখার পাশাপাশি তিনি রচনা করেন বেশকিছু আখ্যান। আখ্যানগুলি মূলত প্রণয়ভাবনাকেন্দ্রিক। এই আখ্যানের চরিত্রগুলিকে তিনি বিশ্বের নানা দেশের নানা যুগ থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। চরিত্রগুলি একটি মোটা দাগে এক সরলরেখায় মিলিত; প্রেম ও বিরহকেন্দ্রিক টানাপোড়েনই চরিত্রগুলির মূল মিলনবিন্দু। এ গ্রন্থের ব্যাপ্তি বিশ্ব মানচিত্র জুড়ে। পৃথিবীর ইতিহাস যাঁদের কথা পড়েছে বইয়ের পাতায়; জেনেছে রাজনীতির মোড়কে। বিশ্ব রাজনীতির সেই সব তাবড় চরিত্রেরাই এই আখ্যানমালার প্রধান পাত্র-পাত্রী। শিশিরকুমার দাশের অনন্য বর্ণনাগুণে তাঁরা সকলেই রাজপ্রাসাদের বৈভব ছেড়ে, খিলাত ছেড়ে হয়ে উঠেছে রক্তমাংসের সাধারণ মানব-মানবী। শাসকের চিরপরিচিত দূরত্ব ঘুচে গিয়ে তাঁরাও হয়ে উঠেছে ঘরের মানুষ, কাছের মানুষ। চরিত্রগুলির ক্রুদ্ধ চোখের আড়ালে লুকিয়ে থাকা সংবেদনশীল হৃদয়ে নোনা জলের ঢেউ দেখে সিক্ত হয়ে উঠেছে পাঠকের হৃদয়। ইতিহাসের সমস্ত বর্ণনাকে মনে হয়েছে ঝুটো, মেকি। বেলগ্রেড, প্যারিস, নীলনদ, ইংল্যান্ড, মস্কো, দিল্লি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে একটি সরল রেখায়; মানুষের একমাত্র আদিম ও ধ্রুব স্তম্ভ ভালোবাসার কাছে।

প্রথম আখ্যানটির শিরোনাম ‘আলেকজান্ডার’ (একটি অখ্যাত প্রেমের কাহিনি)। সার্বিয়ার রাজপুত্র আলেকজান্ডার ও একটি অতি সাধারণ বিধবা রমণী দ্র্যাগা ম্যাসিনের অসম প্রণয় উপাখ্যান, লভ্ জিহাদই এর কেন্দ্রীয় বিষয়। দ্বিতীয় আখ্যানটির কাহিনিটি গড়ে উঠেছে জন্ম ও বংশ পরিচয়হীন এক সুন্দরী নারী পামেলাকে কেন্দ্র করে। তৃতীয় আখ্যানটি গড়ে উঠেছে নীলনদের দেশ মিশরের সবচেয়ে সুন্দরী রাজকন্যা ক্লিয়োপেট্রাকে কেন্দ্র করে। চতুর্থ আখ্যানে আছে সোফি ডরোথির কথা। শিশিরকুমার দাশ পঞ্চম প্রণয় আখ্যানটিকে পূর্ণতা দিয়েছেন রুশ সম্রাজ্ঞী দ্বিতীয় ক্যাথরিনকে কেন্দ্র করে। ষষ্ঠ কাহিনি ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম কারণ রাজা ষোড়শ লুই-এর রাজমহিষী আঁতোয়ানেতকে কেন্দ্র করে। আর এই কাহিনির মূলে রয়েছে এক হিরের হার। সপ্তম আখ্যান ইংল্যান্ডের প্রসিদ্ধ রানি প্রথম এলিজাবেথকে ঘিরে। শেষ আখ্যানটি ইতিহাসের এক উপেক্ষিতা নারী আয়েশাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। শেষ আখ্যানটির ক্ষেত্রে শিশিরকুমার দাশ তাঁর অনবদ্য প্রণয়ভাবনা-সিক্ত দৃষ্টি ফেরান নিজের দেশের ইতিহাসের দিকে। প্রেক্ষাপট বিছিয়ে দেন মুঘল রাজ দরবারে। এই আখ্যানের মূল পাত্র-পাত্রী ঔরঙ্গজেবের এক পুত্র মহম্মদ ও সুজার কন্যা আয়েশা।

প্রেমের জোয়ারে কোনো এক ম্লান জ্যোৎস্নায় শতাব্দী থেকে শতাব্দী আগে এই পৃথিবীরই কোনও এক ভূখণ্ডে ভালোবেসেছিল তাঁরা সকলেই। আদরে আদরে সেঁকে নিয়েছিল নোনাধরা

সম্পর্ক। প্রভূত ক্ষমতা, ব্যক্তিত্ব, অর্থ, প্রতিপত্তি সমস্তকিছু থাকা সত্ত্বেও খড়-কুটোর মতো তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল প্রণয়ের চোরা স্রোত। বার বার মাথা নোয়াতে বাধ্য করেছিল চরম ভয়াবহতার কাছে, দুঃস্বপ্নের কাছে। আবার রাজদণ্ড রক্ষার তাগিদে, রাজনীতির স্বার্থে প্রেমিক-শাসককে ভুলতে হয়েছে তাঁর অনুভূতি, বিসর্জন দিতে হয়েছে সমস্ত আবেগ। বিশ্ব রাজনীতির এমনই বহুচর্চিত দশটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে শিশিরকুমার দাশ গড়ে তুলেছিলেন এই আখ্যানমালার অবয়ব। তাঁর সৃজনশীল সাহিত্যের তালিকায় এই আখ্যানগুলি নিঃসন্দেহে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম।

স্বনামে সাহিত্য সৃষ্টির পাশাপাশি শিশিরকুমার দাশ ছদ্মনামেও বেশকিছু ভিন্ন স্বাদের গদ্য উপহার দিয়েছেন। প্রকরণগতভাবে সেগুলিকে হয়তো চেনা কোনো রীতি অনুসারে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। তবে ছদ্মনামের আড়ালে লুকিয়ে থাকা কথকতায় ভর করে ব্যক্তি শিশিরকুমার দাশের মনের অতলকে ছুঁয়ে দেখা সম্ভব অনায়াসেই। কোনো ব্যক্তি যখন তার পরিচিত নামটিকে গোপন রেখে স্ব-গৃহীত একটি নাম গ্রহণ করেন, তখন তার মধ্যে ব্যঞ্জনার অন্তরালে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। মূলত সমাজের কাছে যা অপ্রিয়, যে সমালোচনায় সমাজের মনে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে তেমন কিছু বার্তা তুলে ধরার লক্ষ্যেই সাহিত্যিকেরা ছদ্মনামের আশ্রয় নিয়ে থাকেন।

এলোমেলো কিছু ভাবনাকে গদ্যরূপ দেওয়ার লক্ষ্যে শিশিরকুমার দাশ গ্রহণ করেন ‘পরীক্ষিৎ সেন’ ছদ্মনাম। নিঃসন্দেহে এই গৃহীত ছদ্মনামের তুলনায় স্বনামেই তাঁর অধিক পরিচিতি। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ‘বঙ্গীয় শব্দকোষ’ অভিধানে ‘পরীক্ষিৎ’ নামের অর্থ বিশ্লেষণে জানাচ্ছেন, “চন্দ্রবংশীয় রাজ বিশেষ। ইঁহার পিতা অভিমন্যু, মাতা উত্তরা, পুত্র জন্মেজয়। অশ্বত্থামার ব্রহ্মাস্ত্রে নিহত হইয়াও, কৃষ্ণের যোগপ্রভাবে ইনি পুনর্জ্জীবিত হন। ইনি কলির শাসনকর্তা, স্বরাজ্য হইতে কলিপ্রভাব দূর করেন।...”[৫০]

আশির দশকের শুরুর দিকে দিল্লির বেঙ্গলি অ্যাসোসিয়েশান প্রকাশিত ‘দিগঙ্গন’ পত্রিকায় ‘পরীক্ষিৎ সেন’ ছদ্মনামে শিশিরকুমার দাশের বেশ কয়েকটি গদ্য প্রকাশিত হয়। গদ্যগুলির ভাষা, শব্দ প্রয়োগ, বাক্যগঠন ও শিল্পরীতি নিঃসন্দেহে এক নতুন সম্ভাবনার আভাস দেয়। নিপাট বৈঠকি মেজাজ, আড্ডার ভঙ্গিমায় সরল ও সরস গল্প বর্ণনার মধ্য দিয়ে পরীক্ষিৎ তাঁর দর্শনের যাবতীয় খুঁটিনাটি ভাগ করে নেন পাঠকের সঙ্গে। এই দর্শন যতটা জীবনকেন্দ্রিক তার চেয়ে অনেক বেশি সমাজকেন্দ্রিক, অভিজ্ঞতাকেন্দ্রিক। সামাজিক কিছু রীতি, বিশ্বাস ও নিয়মকে রীতিমতো বুড়ো আঙ্গুল দেখানোর প্রয়াসেই পরীক্ষিতের এই ভিন্ন কথনরীতি নির্মাণ। ভাব ও ভাবনার সমন্বয়ে, ভাষার অনবদ্য চাতুর্যে এমনকিছু যুগসত্য পরীক্ষিতের লেখায় উঠে আসে যা অনায়াসে চিনিয়ে দেয় সমাজের প্রকৃত মুখ ও মুখোশ। বাক্যরীতিতে বুদ্ধিদীপ্ত ‘হিউমর’-এর

ব্যবহার গদ্যগুলিকে করে তোলে সুপাঠ্য, সুললিত। মুগ্ধতা ও আবেশের মোড়কে উপস্থাপিত গদ্যগুলির মূল উদ্দেশ্য সচেতন পাঠক মাত্রই অনুমেয়।

পুরাণ চরিত্র ‘পরীক্ষিৎ’-এর মতোই পরীক্ষিৎ সেনেরও প্রত্যাশা ছিল ‘স্বরাজ্য হইতে কলিপ্রভাব দূর’[৫১]— এবং তত্ত্বগতভাবে তা অনেকটা ‘Socialist realism’-এর সঙ্গে খাপ খায়। ‘Socialist realism’ এমন এক দর্শন যা মূলত ঐতিহাসিক বাস্তবতার ধারা অনুসরণ করে সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির সার্বিক মুক্তি, বিবর্তন ও উন্নয়নে সহায়তা করে। এই বৃহৎ উদ্দেশ্যেই পরীক্ষিতের এই ভিন্ন ধারার গদ্য নির্মাণ। এই সচেতন উদ্দেশ্যগুলির পোস্টমর্টেমে বেরিয়ে আসে এমনকিছু সামাজিক সত্য— যা মূল্যবোধের স্থায়িত্বকে গভীর প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করায়।

‘সাহিত্যের পুরস্কার’ নকশায় ব্যঙ্গ ও কটাক্ষে সাহিত্যে প্রচলিত পুরস্কারগুলি সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করেছেন পরীক্ষিৎ। ‘আমার বাড়ি খোঁজা’ নকশায় দিল্লি শহরে আগত এক যুবকের ভাড়া বাড়ি খোঁজা এবং তাকেন্দ্রিক নতুন যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়, তাই তিনি অনবদ্য ভঙ্গিমায় তুলে ধরেছেন। ‘আত্ম-জীবনী’-তে হঠাৎ লেখক হতে চাওয়া এক ব্যক্তির লেখা শুরু করার নানা সমস্যা এবং তা থেকে নিস্তার পাওয়ার অনবরত চেষ্টার কথা আত্মকথনরীতিতে বর্ণিত হয়েছে। ‘সার্টিফিকেট’ রচনাটিতে ব্যক্তিজীবনে সার্টিফিকেট অর্থাৎ ডিগ্রি বা উপাধির নানান প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতাকে প্রবল হাস্যরসের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন। ‘গাধা’ ও ‘হিমেনেথের গাধা’ নকশা দু-টিতে পরীক্ষিৎ সেন গাধাদের প্রতি মানুষের দু-টি বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গির চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। একদিকের চিত্রে গাধাদের প্রতি মানুষের চিরাচরিত দূর-ছাই মনোভাবের প্রকাশ যেমন ঘটেছে তেমনি অপর চিত্রে গাধাকে সঙ্গী করার কথা, সন্তান স্নেহে ভালোবাসার কথা ফুটে উঠেছে। এই ধারারই অপর এক সংযোজন ‘আজি হতে দশবর্ষ পরে’। এই রচনায় পরীক্ষিৎ সেন সরাসরি প্রকাশনা ব্যবসায়ীদের প্রতি তাঁর ক্ষোভের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।
স্বাভাবিকভাবেই স্বনামে এইসমস্ত প্রতিবাদ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, কটাক্ষের মতো কাজগুলি করা সহজসাধ্য ছিল না। ছদ্মনাম গ্রহণ আবশ্যিকভাবেই প্রয়োজন ছিল। শিশিরকুমার দাশ ‘পরীক্ষিৎ সেন’ ছদ্মনাম গ্রহণ করে সেই প্রয়োজন সার্থকভাবেই মিটিয়েছেন।

শিশিরকুমার দাশের সৃজনশীল গদ্য তালিকায় অপর একটি অনবদ্য সংযোজন ‘দূর লালপুর’। এই গদ্যটি তাঁর কবিসত্তারও অন্যতম পরিচায়ক। চল্লিশের দশকের শেষদিকে বেশকিছু দিন তিনি ভবানীপুরের ভাড়া বাড়ি ছেড়ে চক লালপুর অঞ্চলে বসবাস করেন। ছেলেবেলায় কাটানো লালপুরের স্মৃতি তাঁর মনে একটা চিরস্থায়ী জায়গা করে নেয়। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে সেই লালপুরের স্মৃতিকেই এই গদ্যের মধ্য দিয়ে তিনি লেখ্য রূপ দেন। প্রকৃতি-প্রকৃতির অনাবিল শোভা, লালপুরের চাঁদ, মাঠ, পুকুর, মানুষ-জন অনায়াসে শিশিরকুমার দাশের অনবদ্য বর্ণনায় এই গদ্যে উঠে আসে।

'পুরনো চাঁদ' অংশে চাঁদের মায়াবী আলোয় গ্রাম বাংলার যে অপরূপ শোভা ফুটে ওঠে তা তিনি অসামান্য বর্ণনাগুণে ব্যক্ত করেছেন। 'বাঘ' অংশে গ্রামের পরিবেশে বাঘের সম্মুখীন হওয়ার অভিজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। 'দুপুর' অংশটি পড়তে গিয়ে মনে পড়ে যায় দেবেশ রায়ের 'দুপুর' ছোটোগল্পের কথা। শিশিরকুমার দাশ তাঁর শৈশবে জ্যৈষ্ঠের দুপুরে যে মাদকতা, যে ঝিমন্ত পরিবেশে দুপুরের মায়ার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন তাই যেন আরশির মতো স্পষ্ট ফুটিয়ে তোলেন এই অংশে। 'পাল্কি' অংশে পাল্কিকে ঘিরে শিশিরকুমার দাশের শৈশব-স্মৃতি ব্যক্ত হয়েছে। 'প্রদীপ হাতে মলি দাসী' অংশে হঠাৎ সন্ধ্যা নামা অন্ধকারে বালক মনে যে বিস্ময়ের উদয় হয়েছিল তা অতি নিপুণ দক্ষতায় ব্যক্ত হয়েছে। 'পরান গান'-এ রয়েছে সেই নামে এক ধূর্ত লোকের বর্ণনা। 'মৃত্যু' অংশে মৃত্যু যে কতটা আকস্মিক, কতটা ভয়াবহ সেই বিষয়টিই পাঠশালার পণ্ডিতের হঠাৎ মৃত্যু দৃশ্য বর্ণনার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। 'ধবল সারস', 'কেয়া', 'শকুন', 'প্যাঁচা', 'কেয়ার কান্না', 'ময়ূর' ইত্যাদি অংশে শিশিরকুমার দাশ এমনভাবে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম করে পাখিদের বর্ণনা করেছেন যা তাঁর কবিত্বশক্তির পরিচয় দেয়। 'লুকোচুরি' অংশে লালপুরের শালবনে পাতার তলায় হাওয়ার সঙ্গে হাওয়ার লুকোচুরি খেলার খুনসুটিকে তুলে ধরেছেন। 'নিমাইয়ের দোকান' গ্রাম বাংলার সেই পরিচিত ঠেকের গল্প শোনায়। 'অগস্ত্য' আখ্যানাংশটি মনে করিয়ে দেয় মহাশ্বেতা দেবীর 'জাতুধান' গল্পের কথা— "পিরামিডের আকার উঁচু ভাত সরু হইয়া উঠিয়াছে।... কোনোদিন যে কেহ এই পর্বতের পদমূলে সমতলে নামিতে পারিবে এমন ভরসা হইল না।..."[৬৭] 'পূর্বপুরুষ' অংশে শিশিরকুমার দাশ তাঁর পৈতৃক অঞ্চলে থাকা শ্মশানের বর্ণনা করতে গিয়ে নস্টালজিক হয়ে পড়েন। 'যক্ষ' অংশে আছে গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে থাকা 'যক্ষ'-কে ঘিরে মিথের প্রসঙ্গ। 'শীতের বেলা' অংশে গ্রাম বাংলার অতি পরিচিত শীত, শীতের সুন্দর 'কমলালেবু রোদ' অসামান্যভাবে বর্ণিত হয়েছে। শীতের বর্ণনা শেষে শিশিরকুমার দাশ 'প্রলয়' অংশে তুলে ধরেছেন লালপুরে হঠাৎ ঘটে যাওয়া বন্যার কথা। কীভাবে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে বানের জল মুহূর্তে ভাসিয়ে দিয়েছিল গোটা গ্রাম তারই অভিজ্ঞতা ছড়িয়ে আছে এই আখ্যানাংশ জুড়ে। বন্যার পর 'উদ্ধার' অংশে একটি ছোটো ডিঙ্গি নৌকোর সহায়তায় বন্যার জল থেকে বালক শিশিরকুমার কীভাবে রক্ষা পেয়েছিলেন সেই স্মৃতি তিনি ভাগ করে নিয়েছেন। 'ভয়' অংশে এই বন্যার স্মৃতিই জারি থেকেছে। বন্যা যে কতটা ভয়াবহ হতে পারে তার সাক্ষ্য মেলে 'মলী দাসীর মৃত্যু' অংশে। বন্যার ভয়াবহ স্রোত ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মলি দাসীকে। সঙ্গে পরিচারিকা মলিনাকেও। এই মলী দাসীকে ঘিরে তাঁর লালপুর যাপন নানাভাবে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তার মৃত্যু শিশিরকুমার দাশের বর্ণনায় এই আখ্যানে গভীর বিষাদ নিয়ে আসে।

শৈশবে অর্জিত অসংখ্য অভিজ্ঞতার সমাহারে পূর্ণ এই গদ্যের নানা অংশে শিশিরকুমার দাশের নিজেকে জানার ও চেনা চৌহদ্দিতে, চেনা পরিবেশে নিজেকে খুঁজে পাবার কথা ব্যক্ত

হয়েছে। এই লালপুরই তাঁকে জানকীনাথের মন্দিরে ‘বৈষ্ণবী’ গানের সঙ্গে, ‘জহর পাটদার’ গড়া অসংখ্য মূর্তির সঙ্গে, বিহার থেকে গ্রামে আসা ‘রামদাস বাবাজী’-র সঙ্গে পরিচয় করিয়েছে। এমনকি এই লালপুরেই তিনি জীবনে প্রথম ডাকাতির মতো ঘটনার সম্মুখীন হন। এই সময়পর্বে জীবনের ঝুলিতে জমা হওয়া অসংখ্য মুখ্য ও গৌণ ঘটনা শিশিরকুমার দাশকে জগৎ চিনিয়েছে। তিনি সমৃদ্ধ হয়েছেন অন্তরে-বাইরে। আর এই সমস্ত অর্জনই সারাজীবন ধরে জ্বালানির মতো শক্তি জুগিয়ে গেছে তাঁর সৃজনশীল সাহিত্য নির্মাণের পথে। ‘দূর লালপুর’ শিশিরকুমার দাশের পরিচিত গদ্য ধারায় নিঃসন্দেহে এক অনন্য ব্যতিক্রম। এই গদ্য একদিকে যেমন ছক ভাঙা এক গদ্যরীতির মেজাজ পাঠকের সামনে উপস্থিত করে তেমনি ব্যক্তি শিশিরকুমার দাশের মনের অতলের খোঁজ পেতেও এই অভিজ্ঞতা নির্ভর গদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্র

৯. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বঙ্গীয় শব্দার্থ কোষ’,

১০. ওই

১১. শিশিরকুমার দাশ, “দূর লালপুর”, ‘প্রমা’ (১০ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, জুলাই-মে ১৯৮৮), পৃ ৪১

চিত্রসূত্র

১. শিশিরকুমার দাশের কৈশোরের ডায়েরি, অপ্রকাশিত

পঞ্চম অধ্যায়

শিশিরকুমার দাশের শিশুসাহিত্য: শিশুমনের বিচিত্র অবলোকন

শিশিরকুমার দাশ বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি শিশুসাহিত্যের জগতে পদার্পণ করা এমন এক ব্যক্তিত্ব যিঁনি জীবনব্যাপী বহু ব্যস্ততা, গবেষণা, শিক্ষকতা, দেশ-বিদেশে বিভিন্ন আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করেও, প্রজ্ঞা ও মেধার একবারে চরম স্তরে পৌঁছেও নিজের অন্তরে সুপ্ত থাকা শৈশবটিকে শেষ দিন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন।

মহাকাশজুড়ে অসংখ্য নক্ষত্র। কিন্তু বিভিন্ন সাহিত্য ও আখ্যানে যে সমস্ত নক্ষত্রকে ঘিরে লোককথা প্রচলিত, সেগুলিকেই তিনি আলোচনার জন্য নির্বাচন করেছেন। 'তারায় তারায়' গ্রন্থের আখ্যানগুলিকে আপাতভাবে তারাদের নিয়ে বলে চলা নিছক গল্প বলে মনে হলেও বর্ণনার অভিনবত্বে এই আখ্যানগুলি নতুন রীতিতে উঠে এসেছে। লোককথা বা পৌরাণিক আখ্যানগুলি কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ইত্যাদি বিষয় ব্যতিরেকে গড়ে ওঠেনি। তাই এগুলি কতটা কিশোর বয়সোপযোগী তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। কিন্তু কিশোর মনে জাগতিক সমস্ত অনুভূতি সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণা গড়ে তোলা একজন সচেতন শিশুসাহিত্যিকের দায়ের মধ্যেই পড়ে। তাই 'পুরোনো কাহিনী নতুন কালের কিশোর-কিশোরীদের আনন্দ দিতেও পারে।'[১] শিশিরকুমার দাশের এই প্রত্যাশা একেবারেই অমূলক নয়।

শিশিরকুমার দাশের ছোটোদের লেখালেখির তালিকায় এই জীবনীকেন্দ্রিক সাহিত্যেরও দেখা মেলে। 'ভারতের মহান লেখাকেরা' রচনাটিতে প্রথমেই এসেছে আদি কবি বাল্মীকির প্রসঙ্গ। বাল্মীকির পরেই এসেছে বেদব্যাসের কাহিনি। এরপর তিনি কালিদাসের সঙ্গে কিশোর-কিশোরীদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। দক্ষিণ ভারতের একজন অন্যতম কবি কম্বণ (কাম্বার বা কবিচক্রবর্তি কাম্বান)। যিনি তামিল ভাষায় 'রামায়ণ' রচনা করেছিলেন। কবি কম্বণ প্রসঙ্গে শিশিরকুমার দাশ বলেছেন, বাল্মীকির রামায়ণকে তামিলভাষায় তিনিই নতুন করে জন্ম দেন। এরপর শিশিরকুমার দাশ উত্তরপ্রদেশ তথা ভারতের অন্যতম কবি তুলসী দাসের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন।

এরপর ক্রমান্বয়ে বৈষ্ণব পদাবলি রচয়িতা বিদ্যাপতি, উর্দু সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি গালিব ও 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা জয়দেবের কথা তিনি বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁদের সৃষ্টিগুলিও কিশোরবোধ্য করে পরিবেশন করা হয়েছে। ভারতের উল্লেখযোগ্য কবি বা লেখকদের কথা বলতে গিয়ে শিশিরকুমার দাশ বাংলা ভাষার দু-জন লেখককে বেছে নিয়েছেন। একজন হলেন 'বন্দেমাতরম্'-এর উদ্গাতা— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। অপরজন ভারতের জাতীয় সঙ্গীতের প্রণেতা— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিশিরকুমার দাশ ‘মাইকেল’ নামে ছোটোদের উপযোগী একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। গ্রন্থটির বিষয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী। ছোটোদের জন্য সহজ-সরল ভাষায়, অতি সংক্ষিপ্ত বর্ণনায় মোট কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত এই জীবনী গ্রন্থে মাইকেল মধুসূদন দত্তের সৃষ্টির যাবতীয় পরিচয় সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন শিশিরকুমার দাশ।

‘আর্গোস’ উপন্যাসটির কেন্দ্রে রয়েছে একটি কুকুর। একটি পশুর প্রতি একটি ছোটো মেয়ের নিবিড় ভালোবাসার কাহিনিই এই উপন্যাসটির মূল বিষয়। কাহিনিটি দশ-এগারো বছরের এক দিল্লিবাসী বাঙালি মেয়ের জবানীতে বর্ণিত হয়েছে। শিশিরকুমার দাশের ব্যক্তিগত ডায়েরি পড়ে জানা যায়, আর্গোস নামে তাঁর পরিবারেও একটি পালিত কুকুর ছিল। তাই অনুমান, এই কাহিনিটি আসলে তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতারই ফসল। উপন্যাসটির সূচনা ঘটে কথক মেয়েটির ও তার ছোটদার একটি কুকুর ছানা উপহার পাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

‘আর্গোস’ উপন্যাসটিতে কুকুরটির এই নামকরণের কারণ জানাতে গিয়ে তাদের কাকু অদিসেউসের গল্প উল্লেখ করেছেন। গ্রিক মহাকাব্য থেকে এমন একটি গ্রিক শব্দ তুলে এনে তা নামকরণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা ধ্রুপদি গ্রিক ভাষায় পারদর্শী শিশিরকুমার দাশের পক্ষেই সম্ভব ছিল। আর্গোসের কাহিনি বর্ণনায় শিশিরকুমার দাশ যেভাবে কাকুর মুখ দিয়ে হোমারের কাব্যে উল্লিখিত কুকুরটির পরিণতির কথা তুলে এনেছেন তা থেকে এই উপন্যাসে বর্ণিত কুকুরটির শেষ পরিণতি সম্পর্কেও একটা আঁচ পাওয়া যায়। শিশিরকুমার দাশ অতি নিপুণ কৌশলে এই কাহিনিটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসে কোনোরকম অতিলৌকিক বা অলৌকিক ঘটনার ব্যবহার নেই, নেই ‘সুড়সুড়ি’ দিয়ে হাস্যকর পরিস্থিতি তৈরির অহেতুক চেষ্টা। সমস্ত ঘটনাই এখানে অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছে। শুধুমাত্র প্রাঞ্জল ভাষারীতির প্রয়োগই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এই কাহিনির সঙ্গে জুড়ে রাখতে পেরেছে কিশোর বয়েসি পাঠকদের। একটি পরিবারের সুখ ও দুঃখের চেনা চেহারার সঙ্গে কিশোর হৃদয়কেও শিশিরকুমার দাশ অনায়াসে জড়িয়ে নিয়েছেন। ঠিক যেভাবে পোষ্য কুকুর আর্গোসের মৃত্যুর পর শিশিরকুমার দাশের চোখ একদিন ভিজে উঠেছিল সেভাবে আর্গোসের মৃত্যু দৃশ্য পাঠকের চোখ ভিজিয়ে দেয়, ভিড় করে আসে বিষণ্ণতা। মুছে যায় বয়সের সমস্ত ভেদ রেখা।

কিশোর-কিশোরীদের উদ্দেশ্যে ‘চিংড়ি’ নামে তিনি আরও একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। কাহিনির উৎকর্ষতা, প্লট নির্মাণের পরিকল্পনা ও ক্লাইম্যাক্স সৃষ্টির দক্ষতার জন্য এই উপন্যাসটিকে তাঁর শ্রেষ্ঠ ছোটোদের উপযোগী গদ্য গ্রন্থের পর্যায়ে রাখা যায়। পাশাপাশি এটি বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের ইতিহাসেও অন্যতম একটি মাইলফলক। লুইস ক্যারলের ‘Alice in The Wonderland’-এর সঙ্গে এর কাঠামোগত কিছু মিল রয়েছে। তাই

চরিত্রগতভাবে এই রচনাটিকে কল্প-আখ্যানের পর্যায়ভুক্ত করা যেতে পারে। ‘Alice in The Wonderland’-এ অ্যালিস স্বপ্নরাজ্যে পরিভ্রমণ করে বেরিয়েছে। আর ‘চিংড়ি’ আখ্যানে কল্পরাজ্যে উদ্ভট সমস্ত ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে গল্প কথক রঘু, বন্ধু সতীশের সাহচর্যে। আখ্যানটি ছোটোদের পাতে পরিবেশনের পূর্বে স্বল্প পরিমাণে স্বাদ অনুসারে ম্যাজিক রিয়ালিজমের নুন ছড়িয়ে দিয়েছেন শিশিরকুমার দাশ। ফলে ঘটনায় এসেছে অনন্যতা। চমৎকারিত্বের গুণে এই আখ্যানটিকে অনায়াসেই সুকুমার রায়ের ‘হ-য-ব-র-ল’-এর পরের আসনেই স্থান দেওয়া যেতে পারে। সুকুমার রায়ের ‘হ-য-ব-র-ল’ পড়লে দেখা যাবে সেখানেও এমন অঙ্কের ফ্রাকশান নিয়ে রয়েছে বিস্তর চিন্তা-ভাবনা। এই কাহিনি পরিকল্পনায় বহু ক্ষেত্রেই সুকুমার রায়ের ‘হ-য-ব-র-ল’ থেকে নানা প্রসঙ্গ ও ঘটনা তুলে এনে শিশিরকুমার দাশ নিজের মতো করে তা সাজিয়ে দিয়েছেন। এই আখ্যানের বহু চরিত্রেই ইশপের গল্প ও সুকুমার রায়ের সৃষ্টি চরিত্রগুলির সরাসরি প্রভাব ঘটেছে। উদাহরণ হিসেবে সুকুমার রায়ের ন্যাড়া চরিত্রটির নাম করা যেতে পারে।

ঘটনা-পথ পেরিয়ে এসে কিশোর বয়েসিরা যখন সদ্য নিজেদের ভাবনা-জাল ছড়াতে শুরু করেছে, বাঙালি কিশোরের চিরদিনের ফেলুদা কিংবা ব্যোমকেশ হতে চাওয়ার তালিকায় যুক্ত হতে চলেছে রঘু হতে চাওয়ার বাসনা, ঠিক তখনই লুইস ক্যারলের অ্যালিস বা হেমেন্দ্রকুমার রায়ের অমলা কিংবা শিশিরকুমার দাশের রঘু ফিরে আসে বাস্তবে। স্বপ্নে দেখা ‘ওয়ান্ডার ল্যান্ড’ কিংবা ‘আজবদেশ’-এর উত্তরসূরি হয়ে জেগে থাকে সতীশের মামাবাড়ির পেছনের বিস্তীর্ণ মাঠ। আখ্যান শেষ হয়। সংশয় বজায় থাকে কিশোর মনে।

কিশোর বয়েসিদের জন্য লেখা ‘ভালুকের হাসি’ নাটকটি আদ্যপান্ত কৌতুক রসে পূর্ণ। শিশিরকুমার দাশ কয়েকজন কিশোর-কিশোরীকে এই নাটকের চরিত্র করে কিশোর বয়সের খুনশুটিগুলি সুচারুভাবে তুলে এনেছেন। এই নাটকের একটি অন্যতম বিষয়, সংলাপের ব্যবহার। তাই আমেরিকা থেকে আসা সন্দীপের সংলাপে বাংলা শব্দের ভাঁজে ভাঁজে অনায়াসে ইংরেজি শব্দ মিশে যায়। দিপু এই নাটকে সবচেয়ে দীপ্ত চরিত্র। তার এই চারিত্রিক দৃঢ়তা ফুটে ওঠে সংলাপে। কণ্ঠস্বরের বদল না ঘটলেও শুধুমাত্র সংলাপ শুনে চরিত্রগুলিকে পৃথকভাবে চেনা যায়। এই সামান্য পরিসরে এত সচেতন সংলাপের প্রয়োগ শিশিরকুমার দাশের মতো একমাত্র উচ্চমানের নাটককারের পক্ষেই সম্ভব।

মোট এগারোটি ছড়া-বান্ধুলিতে বাধা ‘সোনার পাখি’ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে জুলাই মাসে। এই ছড়াগুলির মধ্যে আছে কৌতুকের যথেষ্ট উপকরণ, অ্যাবসার্ড কিছু ভাবনার প্রয়োগ, দৃশ্য ও ছন্দ নির্মাণের অসামান্য কারুকাজ। ছড়াগুলি যেহেতু তাঁর যৌবনের প্রথম লগ্নে লেখা তাই, অসচেতনভাবেই ছড়াগুলিতে পূর্বসূরিদের সূক্ষ্ম প্রভাব বজায় থেকেছে। তবে অধিকাংশ

চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে শিশিরকুমার দাশের মৌলিকতা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। ‘সোনার পাখি’-র প্রায় সমস্ত ছড়াই দলবৃত্ত ছন্দে রচিত। তবে বেশকিছু পঙ্‌ক্তির ক্ষেত্রে ছড়াকার এই ছন্দরীতিকে মেনে চলেননি। তা সত্ত্বেও পঙ্‌ক্তিগুলির অন্ত্যমিলের ক্ষেত্রে কোনোরকম হেরফের ঘটেনি। বোঝা যায়, এই ছক ভাঙতে পারার মধ্যেও আছে শিশিরকুমার দাশের মৌলিক ভাবনার ইন্ধন।

শিশিরকুমার দাশের দ্বিতীয় ছড়ার বই ‘চাঁদমামা ও বাঘের মাসি’ প্রকাশিত হয় ২০০২ সালে জানুয়ারি মাসে। বাংলা শিশুসাহিত্যের ইতিহাসে ননসেন্স কল্পনা নির্ভর ছড়ার প্রচলন ঘটে সুকুমার রায়ের হাত ধরে। এই গ্রন্থের ছড়াগুলির মধ্যে শিশিরকুমার দাশ সেই সুকুমাররীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। ‘চাঁদমামা ও বাঘের মাসি’-র প্রতিটি ছড়াই ননসেন্স কাহিনি নির্ভর। দক্ষ ছন্দ-মাত্রার প্রয়োগে যা হয়ে উঠেছে বাংলা ছড়া জগতের এক অনন্য সম্পদ। আঠাশটি ছড়ার তন্তু সমবায়ে বিন্যস্ত এই বইতে ‘কিং কং’ ও ‘দাদুগো দাদু’ ছড়া দু-টি ‘সোনার পাখি’ থেকে গৃহীত। বাদবাকি ছাব্বিশটি ছড়াই নতুন। ‘চাঁদমামা আর বাঘের মাসি’ ছড়ার সংকলনটিতে শিশিরকুমার দাশ একজন শক্তিশালী ছড়াকার হিসেবে নিজেকে হাজির করেছেন। হাস্যরস পরিবেশনে দক্ষতা, ব্যঙ্গের মধ্য দিয়ে অর্থহীন বিষয়কেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলায় ছড়াকার হিসেবে শিশিরকুমার দাশ নিঃসন্দেহে অদ্বিতীয়। সুকুমার রায়ের পর ননসেন্সের এমন সফল প্রয়োগ নিতান্তই বিরল।

তথ্যসূত্র

৫. ওই, ‘তারায় তারায়’, আই.এম.এইচ সং, কলকাতা, আই.এম.এইচ, ১৯৯২, পৃ ভূমিকা

চিত্রসূত্র

১. অমিয় ভট্টাচার্য, ‘আর্গোস’ (শিশিরকুমার দাশ), “আনন্দমেলা” (১৩ ডিসেম্বর ১৯৮৯), পৃ ৭০
২. সুদীপ্ত বসু, ‘চিংড়ি’ (শিশিরকুমার দাশ), কলকাতা, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ ৬৬
৩. অমিয় ভট্টাচার্য, ‘ভালুকের হাসি’ (শিশিরকুমার দাশ), “আনন্দমেলা” (২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬), প\

উপসংহার

'আরিস্টটলের পোয়েটিক্স' সিলেবাসে ছিল। 'তারায় তারায়' পড়েছিলাম অনেক ছোটোবেলায়। একসময় হাতে পাই 'অলৌকিক সংলাপ'। তারপর বহুদিন সারা কলেজ স্ট্রিট খুঁজে ফিরেছি এই আশ্চর্য সংলাপের জন্মদাতাকে। ক্রমে পরিচয় গড়ে ওঠে তাঁর বহু লেখার সঙ্গে। শিশিরকুমার দাশের নানামুখী প্রতিভাকে জানতে পেরে তখন আমি আপ্লুত। 'অবলুপ্ত চতুর্থ চরণ' নিয়ে আসে আরও বড়ো চমক।

শিশিরকুমার দাশ বিংশ শতাব্দীর অন্যতম এক প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিত্ব। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে আছে দেশ জুড়ে। পাণ্ডিত্যের এই খ্যাতি একদিকে যেমন তাঁর মেধার সাক্ষ্যকে বহন করে পাশাপাশি আড়াল করে অপর এক সত্তা; সাহিত্যিক শিশিরকুমার দাশ। ভাবি, এই আশ্চর্য মানুষটিকে নিয়ে গবেষণা করলে কেমন হয়! বাংলা সাহিত্যের পরিসরে গবেষণার জন্য বিষয়ের অভাব নেই। অভাব নেই বহু গবেষিত বিষয়কে পুনঃনির্বাচনের ক্ষেত্রেও। অথচ বাংলা, ইংরেজি, তুলনামূলক সাহিত্য তিনটি ক্ষেত্রেই তাঁকে নিয়ে গবেষণার সম্ভাবনা বিস্তর। খুঁজে দেখি এতি-ওতি। নিশ্চিত হই সঙ্গে অবাকও— শিশিরকুমার দাশকে নিয়ে এর পূর্বে কোনো গবেষণা সন্দর্ভ লিখিত হয়নি। তাঁর মৌলিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে তো নয়-ই। তাই গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করি 'শিশিরকুমার দাশের মৌলিক বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত দর্শন ও মনন'।

এই গবেষণা সন্দর্ভে সাহিত্যের পাঁচটি রীতির ক্ষেত্রে শিশিরকুমার দাশের অনন্যতা অনুসন্ধান করা হয়েছে— কবি শিশিরকুমার দাশ, নাটককার শিশিরকুমার দাশ, প্রাবন্ধিক শিশিরকুমার দাশ, কথাসাহিত্য ও অন্যান্য আখ্যানধর্মী রচনায় শিশিরকুমার দাশ এবং শিশুসাহিত্যিক শিশিরকুমার দাশ। প্রতিটি রীতি অনুসারে তাঁকে নিয়ে পৃথকভাবে গবেষণা সন্দর্ভ প্রস্তুত করা সম্ভব। পৃথক পাঁচটি সৃজনশীল সত্তাই পৃথক গবেষণার বিষয় বা 'থিসিস'। তবে এই গবেষণা সন্দর্ভের অভিনবত্ব— সাহিত্যিক শিশিরকুমার দাশের একটা সামগ্রিক মূল্যায়ন। প্রতিটি অধ্যায় তাঁর সেই ভিন্ন প্রকরণগুলিরই এক-একটা 'সিনোপসিস'।

গবেষণার প্রথামাফিক সীমাবদ্ধতায় শিশিরকুমার দাশের সামগ্রিক মূল্যায়ন হয়তো এই সন্দর্ভে পাওয়া গেল না। তবে তাঁর মতো এক উচ্চমানের কবি, নাটককার, ঔপন্যাসিক, ছোটোগল্পকার, ছড়াকারকে যে এতদিন বাংলার পাঠক সমাজ বিস্মৃতি হয়ে ছিল সেই প্রলেপ-পর্দা কিছুটা হলেও তুলে দেওয়া গেল। তাই, দৃঢ় আশা— এই গবেষণা সন্দর্ভটি ভবিষ্যতে শিশিরকুমার দাশ চর্চায় গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। বহু উত্তর-গবেষক শিশিরকুমার দাশের বহু সৃষ্টিগুলিকে গবেষণার বিষয় হিসেবে নির্বাচন করবে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পরিসর ছাপিয়ে শিশিরকুমার দাশ গবেষণার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবেন ইংরেজি ও তুলনামূলক সাহিত্য ক্ষেত্রেও। এই সন্দর্ভটি সেই চর্চার ভিত্তিকেই প্রস্তুত করে রাখল।